পরিচয়

মাসিক
ত্রিকা

বার্ষিক
৪।০

প্রতি সংখ্যা
১৷

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪০

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪০

পরিচয়

বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ছিলেন? এদেশে ও বিদেশে অল্পদর্শী লোকে তাহাই ভাবে বটে। এমন কি, বাল্মীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বুদ্ধদেবকে স্পষ্টভাষায় 'নাস্তিক' বলা হইয়াছে (ঐ শ্লোক খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত)—

যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকম্ অত্র বিদ্ধি—অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯।৩৪

(অনেকেই বোধ হয় জানেন, বুদ্ধদেবের একটি নাম 'তথাগত')। প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধদেবকে যে, মায়া-মোহের অবতার বলা হইয়াছে, সেও ঐ ধরণের কথা। বুদ্ধদেব নাকি অসুর-মোহনের জন্য এবং বিভ্রান্ত অসুরদের সহজে সংহারের জন্য নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতে সম্মতি দিবার আগে বুঝিতে হয় 'নাস্তিক' বলিলে কি বুঝায়?

এ দেশের আদর্শ নাস্তিক চার্ব্বাক। চার্ব্বাক একাধারে জড়বাদী (Materialist), উচ্ছেদবাদী (Nihilist), দৃষ্টবাদী (Positivist), সংশয়বাদী, হেতুবাদী (Rationalist), প্রেয়ঃবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী ও ইহ-সর্ব্বস্ববাদী। তাঁহার বৈনাশিক দৃষ্টিতে পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, স্বর্গনরক নাই, পরলোক নাই, পুনর্জন্ম নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, ঈশ্বর নাই, মোক্ষ-নির্ব্বাণ নাই। সেই জন্য 'সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ'কার চার্ব্বাককে 'নাস্তিক-শিরোমণি' বলিয়াছেন। অতএব নাস্তিকতার পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে চার্ব্বাকমতের আলোচনা করা আবশ্যক।

'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' চার্ব্বাকমতের যে সার সংগ্রহ আছে, তাহাতে দেখা যায়, চার্ব্বাক দেহাতিরিক্ত আত্মা মানিতেন না—দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। তবে চৈতন্যের উদয় হয় কিরূপে? চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে—ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ এই চারি ভূত মিলিত হইয়া দেহ রচনা করে; ঐ ভূতচতুষ্টয়ের বিকারে 'কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়েতে'। ঐরূপে সঞ্জাত চৈতন্যই আত্মা—স এবাত্মা ন চাপরঃ। বলা বাহুল্য দেহের নাশের সহিতই ঐ আত্মার বিনাশ হয়—Survival of Man বাজে কথা—অতএব দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ।

ইহ-সর্ব্বস্ব চার্ব্বাকের দৃষ্টিতে স্বর্গ নরক, পরলোক, পুনর্জন্ম থাকিতেই পারে না—ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। অতএব, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনঃ কুতঃ? স্বর্গ ত' নাই-ই—আর নরক? কণ্টকাদি-জন্যং দুঃখমেব নরকম্। আর ধর্ম্মাধর্ম্ম? সে ত' উন্মত্তের প্রলাপোক্তি। যাহাই অনুকূল-বেদনীয় (pleasant), তাহাই উপাদেয়;—এবং যে কিছু প্রতিকূল-বেদনীয় (unpleasant), তাহাই হেয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম যখন নাই, তজ্জনিত অদৃষ্টও থাকিতে পারে না—অতঃ তৎসাধ্যম্ অদৃষ্টাদিকমপি নাস্তি।

যদি প্রশ্ন উঠাও—'যদি অদৃষ্ট নাই, তবে এই বিচিত্র বিশ্বের ব্যবস্থা হইল কিরূপে? ইহা কি আকস্মিক (accidental)?' চার্ব্বাকের উত্তর সহজ—স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ।

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শ স্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতংতস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্-ব্যবস্থিতিঃ॥

'অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীততা, বায়ুর শীতলস্পর্শতার ন্যায় জগদ্-বৈচিত্র্যও স্বভাবসিদ্ধ।'

জগতে দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু তাহার ভয়ে সুখ ত্যাগ করা ভীরুতা, মুর্খতা।

তস্মাৎ দুঃখভয়াৎ নানুকুলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুম্ উচিতম্ * * যদি কশ্চিৎ ভীরুঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ, তর্হি স পশুবৎ মুর্খো ভবেৎ। তবেই—যাবৎজীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

—বিশেষতঃ যখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্তেরই উচ্ছেদ হইবে। অতএব Eat, drink and be merry, for tomorrow you die.

যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।

সেই জন্য (চার্ব্বাকমতে) সুখই জীবের লক্ষ্য, এবং সমস্ত সুখের মধ্যে আবার অঙ্গনালিঙ্গনই চরম, পরম সুখ—'পুরুষার্থ'।

অঙ্গনালিঙ্গনাদি-জন্যং সুখম্ এব পুরুষার্থঃ।

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিধিনিষেধ দ্বারা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, কিন্তু ঐ বেদের প্রামাণ্য কি?

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ—

যে বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও আসুর-প্রকৃতির লোকের রচিত—ঐ বেদ মানিতে হইবে? কেন?

বেদকে লোকে 'আগম' বলে—বেদ নাকি আগম-প্রমাণ সিদ্ধ! চার্ব্বাক বলেন, প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণই নাই—অনুমানই অসিদ্ধ—আগম ত' বহুদূরের কথা!

প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেঃ অনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ।

অতএব বহু বিড়ম্বিতের উদ্ধারসাধনার্থ এই রমণীয় চার্ব্বাকমতের শরণ লও—বহূনাং প্রাণিনাম্ অনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতম্ আশ্রয়ণীয়মিতি রমণীয়ম্ (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)।

চার্ব্বাকমতের একটি নাম 'লোকায়ত'—(wide-spread)। সর্ব্বদর্শনকার বলেন, এ নাম সার্থক (লোকায়তম্ ইত্যন্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম্)—নাস্তিকতা জীবের চিত্তে এতই নিরূঢ়! এ মতের আরম্ভ করে? ইহার প্রবর্ত্তক কে? সর্ব্বদর্শনে চার্ব্বাকমতকে বৃহস্পতি-মতানুসারী বলা হইয়াছে এবং বৃহস্পতির নামের সহিত সংযুক্ত কয়েকটা বচনও উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাঃ ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

এই বৃহস্পতি কে?

বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডেও আমরা এক নাস্তিকের সাক্ষাৎ পাই—জাবালি। তিনি কি বৃহস্পতির শিষ্য না গুরু ?

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধ্য বনবাস স্বীকার করিয়াছেন—ভরতের সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ভারত-সাম্রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—এমন সময় জাবালি তাঁহার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। তিনি রামচন্দ্রকে বুঝাইতেছেন :—

"শ্রীরাম! উন্মত্তের ন্যায় এ কি তোমার আচরণ? উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ঃ। পিতৃসত্য ? দশরথ তোমার কে ?

ন তে কশ্চিৎ দশরথঃ ত্বং চ তস্য ন কশ্চন।

পিতাপুত্র ? এই সম্বন্ধ !

ন কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিম্ আপ্যং কস্য কেনচিৎ।
যদ্ একো জায়তে জন্তুঃ এক এব বিনশ্যতি ॥—১০৯।৩

দেখ, প্রত্যক্ষই সার—পরোক্ষ বলিয়া কোন কিছু নাই।

প্রত্যক্ষং যৎ তদ্ আতিষ্ঠ, পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু।

পরলোক ? ইহলোকই সর্ব্বস্ব—পরলোক আবার কি ?

স নাস্তি পরম্ ইত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে! দান, দীক্ষা, তপস্যা, ত্যাগ—মূর্খ-প্রতারণার জন্য এ-সকল বুদ্ধিজীবীর উদ্ভাবন।

দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপঃ তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাই—যাহারা ধর্ম্মের জন্য, পুরুষার্থের জন্য, কষ্ট স্বীকার করে, তাহারা কৃপা-পাত্র—তান্ তান্ শোচামি, নেতরান্। কেন ?

তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য, বিনাশং প্রেত্য লেভিরে।

দেহের অতিরিক্ত যখন আত্মা নাই—তখন শরীরের সহিত আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নহে কি ? অতএব যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে অন্নের অপব্যয় উপদ্রব বই আর কি ? 'মরা গরুতে কখন ঘাস খায় না।'

অষ্টকা পিতৃদৈবত্যম্ ইত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিম্ অশিষ্যতি ?—১০৮।১৪

এই সকল উক্তিদ্বারা জাবালি শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মব্রত টলাইতে পারেন নাই। জাবালির বক্তৃতা শুনিয়া রাম বলিলেন—এ কি 'সুনাস্তিক' ধর্ম্ম-দ্রোহী মত !

ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে

'ধর্ম্মই সমস্তের মূল—সত্যেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।'

একঃপালয়তে লোকম্ একঃপালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকোহি নিরয়ে একঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥—১০৯।১৫

অতএব দেখা যাইতেছে, সেই সুপ্রাচীন রামায়ণ-যুগেও ভারতবর্ষে নাস্তিকমতের প্রচার ছিল।

বুদ্ধদেবের সময়েও নাস্তিকমতের অভাব ছিল না। মজ্ঝিম-নিকায়ে তিনি এইরূপে ঐ মতের বিবৃতি দিয়াছেন :—

নত্থি দিন্নং, নত্থি য়িষ্টং (ইষ্টং), নত্থি হুতং, নত্থি সুকত-দুক্কতানং কম্মানং ফল্লং বিপাকো, নত্থি অয়ং লোকো নত্থি পরো লোকো, নত্থি মাতা নত্থি পিতা, নত্থি সত্তা ওপপাতিকা, নত্থি লোকে সমনব্রাহ্মণা সম্মগ্‌গতা সম্মা-পটিপন্না যে ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সয়ং (স্বয়ং) অভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি।

চাতুম্মহাভূতিকো অয়ং পুরিসো। যদা কালং করোতি, পঠবী পঠবীকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, তেজো তেজোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, বায়ো বায়োকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাসং ইন্দ্রিয়ানি সংকমন্তি। আসন্দি-পঞ্চমা পুরিসা মতং (মৃতং) আদায় গচ্ছন্তি, যাব আলাহনা পদানি পঞ্‌ঞায়ন্তি, কাপোতকানি অট্ঠীনি ভবন্তি। ভস্‌সন্তহুতিয়ো দত্তুপঞ্‌ঞতং যদ্ ইদং দানং। তেসং তুচ্ছং মুসা বিলাপো যে কেচি অত্থিক বাদং (আস্তিক বাদং) বদন্তি। বালে চ পণ্ডিতে চ কায়স্‌স ভেদা উচ্ছিজ্জন্তি বিনস্‌সন্তি, ন হোন্তি পরং মরণা তি।*

* এই-পালি মূলের ইংরাজি অনুবাদ এই :—
There is no such thing as alms or sacrifice or offering. There is neither fruit nor result of good or evil deeds. There is no such thing as this world or the next. There is neither father nor mother, nor beings springing into life without them. There are in the world no recluses or Brahmins who have reached the highest point, who walk perfectly, who having understood and realized, by themselves alone, both this world and the next, make their wisdom known to others. A human being is built up of the four elements. When he dies, the earthy in him returns and relapses to the earth, the fluid to the water, the heat to the fire, the windy to the air, and his senses pass into space. The four bearers, on the bier as a fifth, take his dead body away; till they reach the burning-ground, men utter forth eulogies, but there his bones are bleached and his offerings end in ashes. It is a doctrine of fools, this talk of gifts. It is an empty lie, mere idle talk, when men say there is profit therein. Fools and wise alike, on the dissolution of the body, are cut off, annihilated and after death they are not.—Majjhima Nikaya, 76th Discourse—Translated by Lord Chambers.

অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ে নির্ম্মিত যে দেহ, উহাই জীব। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। শ্মশানেই মানুষের সব শেষ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতি ক্ষিতিতে, অপ্ জলে, তেজঃ অগ্নিতে, মরুৎ বায়ুতে, ইন্দ্রিয় সকল আকাশে মিশাইয়া যায়। অজ্ঞ বিজ্ঞ, সকলেই দেহের নাশের সহিত বিনষ্ট, উচ্ছিন্ন হয়—আর তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। ইহলোক পরলোক—এরূপ ভেদ করা মূর্খতা। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, কর্ম্মফল—এ সমস্ত অলীক কথা। দান শীল ত্যাগ কৃত্য—এ সকলই পণ্ড শ্রম—নিরর্থক্ ও নিষ্ফল। উহা is a doctrine of fools—বালিশ-বাদ মাত্র।

বুদ্ধদেবের যুগে যে সকল 'পণ্ডিতেরা' এই নাস্তিক মত প্রচার করিতেন, তাঁহারা চার্ব্বাকের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন কি না, জানা নাই—তবে তাঁহারা যে তাঁহার সহোদর ভাই, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বুদ্ধদেব ঐ নাস্তিক মতের মণ্ডন করেন নাই—স্পষ্ট বাক্যে খণ্ডন করিয়াছেন—সমর্থন ত' দূরের কথা, যুক্তিদ্বারা নিরসন করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, যদি এই নাস্তিক মত সুস্থিত, সত্যোপেত হইত, তাহা হইলে সমস্ত নৈতিক প্রচেষ্টাই নিরর্থক হইত। (Every moral action upon the earth would be purposeless). তাঁহার শ্রীমুখের বাণী এই ঃ— স চে ইমস্স ভোতো সথুনো সচ্চং বচনং অকতেন মে এথ কতং, অবুসিতেন সে এথ বুসিতং, উভোপি ময়ং এথ সমসমা সামঞ্ঞ পত্তা × × অতিরেকং (superarrogation) খো পন ইমস্স ভোতো সথুনো নগ্গিয়ং মুণ্ডিয়ং উক্কুটিকপ্পধানং কেসমস্সুলোচনং; যোহং পুত্তসংবাধসয়নং অজ্ঝাবসন্তো, কাসিক চন্দনং পচ্চনুভোন্তো, মালাগন্ধবিলেপনং ধারন্তো জাতরূপরজতং সাদিয়ন্তো ইমিনা ভোতা সথারা সমসমগতিকো ভবিস্সামি অভিসম্পরায়ং। সো অব্রহ্মচরিয়াবাসো অয়ংতি ইতি বিদিত্বা ব্রহ্মচরিয়া নিব্বিজ্জ পক্কমতি। *

* এই পালি মূলের ইংরাজী অনুবাদ এই :—This dear teacher sets up such a meaning, such a doctrine : (to wit the materialistic one as reproduced above). If it is true what he is saying, then every moral action upon the earth is purposeless. Then we both are grown exactly the same......... Therefore it is too much if this dear teacher goes naked, shaves his crown, crouches down on his heels, plucks out both hair and beard ; and if I, living in a house full of children, using silk and sandal wood, ornaments and odoriferous ointments, finding pleasure in gold and silver, shall have in future just the same fate as this dear teacher : And he perceives : 'This is not the path to truth' and turns away unsatisfied from such path.

অর্থাৎ তাহা হইলে বিনা সাধনে, বিনা প্রযত্নে, ধর্ম্মজীবন উদ্‌যাপিত হইতে পারিত। যিনি বিলাসসুখে নিমগ্ন থাকিয়া সংসার-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন আর যিনি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া, পার্থিব ভোগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভিক্ষু হইয়া ব্রত ধারণ করেন—এই দুই ব্যক্তির দেহান্তে পরলোক-গতি তুল্যমূল্য হইত। তাহা কখন সম্ভব নহে। অতএব নাস্তিকমত হেয় ও অগ্রাহ্য—'Recognising that this is an antithesis to the higher life the man turns away in disgust।' মানুষের মধ্যে একটা স্বারসিক (স্বভাবসিদ্ধ) moral instinct আছে—জড়বাদীর সযত্ন-রচিত তর্কতরী ঐ অচলে লাগিয়া বানচাল হইয়া যায় (Materialism is already wrecked on the fact of the existence of moral and therefore unselfish actions.—George Grimm)।*

উচিত-অনুচিত সম্পর্কে এই যে সহজাত-সংস্কার, এই যে স্বারসিক বিবেক—বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম্মের উহাই ভিত্তি-ফলক, উহাই স্তম্ভধারক (corner-stone)।

যিনি নাস্তিক, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ মানেন না—অথচ নীতিবাদ বুদ্ধদেবের সমস্ত শিক্ষার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই জন্য পাশ্চাত্যেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন উচ্চাঙ্গের নীতি, এমন high and noble ethics জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মপদ—যাহা

* এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ডু'প্রেল (DuPrel) বুদ্ধদেবের যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, আমরা এই পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Man is the highest fact of nature, and morality is his highest function. * * * But moral instinct is illogical, if human individuality exists only between the cradle and the grave. If the visible part of our career alone had validity, and we went towards our annihilation with full consciousness, then we should resemble men condemned to death, only that our way to the scaffold would be a little longer, and the time uncertain when we should reach it. The law allows the condemned criminal the satisfaction of his wishes for the last days of his life, as was already the case with the ancient Greeks. But we ought to make this claim for the satisfaction of our wishes, for the whole duration of our life, neglecting all preparations for the other world, if as materialists we look upon death as annihilation.

বুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত সুভাষিতের সার-সংগ্রহ—তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে এ সম্পর্কে সন্দেহমাত্র থাকে না।

ধর্ম্মপদ বলেন—ধর্ম্মপীতী সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা—পণ্ডিত-বগ্‌গো 'ধর্ম্ম পালনকারী প্রসন্নচিত্তে সুখে বাস করেন'। কারণ, পুণ্যের ফলই সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ।

দুক্খো পাপস্‌স উচ্চয়ো × × সুখো পুঞ্‌ঞস্‌স উচ্চয়ো—পাপ বগ্‌গো

সুধু জীবিতমানে নয়, জীবনান্তেও ঐ নিয়ম।

পুঞ্‌ঞং সুখং জীবিত সঙ্‌খয়ম্‌হি × ×
পাপানাং অকরণং সুখং—নাগবগ্‌গো

দেখা যায়, বুদ্ধদেব পাপপুণ্যের 'বিপাক' মানিতেন—সেই মনুর প্রাচীন কথা—ফলতি গৌরিব।

মধুবা মঞ্‌ঞতী বালো যাব পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ দুক্খং নিগচ্ছতি ॥—বাল বগ্‌গো

'মূর্খ পাপকে মধুমান্ মনে করে—যতদিন না পাপের বিপাক হয়—যখন বিপাক হয়, তখন দুঃখ ভোগ করিতে হয়।'

পাপোপি পস্‌সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ পাপানি পস্‌সতি ॥
ভদ্রোপি পস্‌সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রানি পস্‌সতি ॥

অর্থাৎ পাপের বিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ—পরে দুঃখ এবং পুণ্যের বিপাক না হওয়া পর্য্যন্তই দুঃখ—পরে সুখ।

অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি।
সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্‌গিদড্‌ঢো ব তপ্পতি ॥—দণ্ডবগ্‌গো

'মূর্খ পাপ করিবার সময় বুঝিতে পারে না—পরে কিন্তু ঐ দুর্বুদ্ধি অগ্নিদগ্ধের ন্যায় তাপিত হয়।' তখন বুঝে—পাপানং অকরণং সুখং।

চার্ব্বাক অঙ্গনালিঙ্গনকেই পরম সুখ বলিয়াছেন—বুদ্ধদেব কিন্তু পরদারসেবীর অশেষ দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়াছেন।

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো
আপজ্জতী পরদারূপসেবী।
অপুঞ্‌ঞলাভং, ন নিকামসেয্যং
নিন্দং ততীয়ং নিরয়ং চতুত্থং ॥—নিরয়বগ্‌গো

'পরদারসেবী প্রমত্ত নর—অপুণ্য, অশান্তি, নিন্দা ও নরক—এ চতুর্বিধ দশা প্রাপ্ত হয়'—অতএব 'তস্মা নরো পরদারং ন সেবে'। বুদ্ধদেবের শিক্ষা এই—পাপকারীকে স্বকৃত পাপের ভার বহিতেই হইবে—ভোগ (retribution) ভিন্ন তাহার ক্ষয় নাই, অর্থাৎ নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটিশতৈরপি। সেইজন্য তিনি বলিতেছেন :—

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স।
ন বিজ্জতী সো জগতী প্পদেসো
যত্থ ট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা ॥

'অন্তরিক্ষে, সমুদ্রগর্ভে, পর্ব্বত-বিবরে—এমন স্থান জগতে কোথায়, যেখানে গিয়া পাপকর্ম্মীর নিষ্কৃতি আছে?'

বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট ধর্ম্ম-নীতি কত উচ্চ, কত উদার, কত মহান্—তাহার পরিচয় দেওয়া কঠিন নহে। তিনি বলেন—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥—যমকবগ্‌গো

'এ জগতে বৈরের দ্বারা বৈর কখনও শমিত হয় না—অবৈরের দ্বারাই বৈর শমিত হয়—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।' অতএব,

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥—কোধবগ্‌গো

'ক্রোধনকে অক্রোধ দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, অসাধুকে সাধু দ্বারা, মিথ্যককে সত্য দ্বারা জয় করিবে।'

শম, দম, সত্য, সহিষ্ণুতা—ইহাকে জীবনের মূলমন্ত্র করিবে—

যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মোচ অহিংসা সঞ্‌ঞমো দমো।
স বে বন্তমলো ধীরো থেরো তি পবুচ্চতি—ধম্মট্‌ঠবগ্‌গো

যাঁহাতে সত্য ধর্ম্ম অহিংসা সংযম দম প্রতিষ্ঠিত, সেই নির্ধুতমল ধীর ব্যক্তিই থের (স্থবির) নামের যোগ্য। তিনিই কাষায়-বস্ত্র ধারণ করিবার অধিকারী—

যো চ বন্তকসাবস্‌স সীলেসু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবম্ অরহতি ॥—যমকবগ্‌গো

যিনি রাগ দ্বেষ মোহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ত্যাগী, জ্ঞানী, মুক্তচিত্ত—তিনিই শ্রমণ হইবার উপযুক্ত।*

রাগং দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥—যমকবগ্‌গো

কেবল বাক্যবাগীশ নয়, যাঁহার বাক্য ও কর্ম্ম সমঞ্জস, যাহার মুখ ও মন এক—তিনিই শ্রমণ-নামের যোগ্য।

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥

অর্থাৎ বহু 'সংহিতা' আওড়াইয়া ফল কি ?, যদি না তৎকর হও—গোপাল যেমন পরের গরুর গণনা করে, তোমারও দেখি সেই দশা—শ্রামণ্য তোমার বহু দূরে! দেখ—সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো কারণ, তথাগতেরা ধর্ম্মের দেশনা করেন মাত্র—করণা তোমাকেই করিতে হইবে—তুম্হেহি কিচ্চং (কৃত্যং) আতপ্পং অকৃখাতারো তথাগতা (মগ্‌গবগ্‌গো).—Your feet must tread the path, the Tathagata can only point the way.

* বুদ্ধদেবের ধর্ম্মনীতির এইরূপে Madame Blavatsky একস্থলে সার সংগ্রহ করিয়াছেন :—Crush out your Pride. Speak evil of no one. Kill thine arrogance. Be kind and gentle to all ; merciful to every living creature, forgive those who harm thee, help those who need thy help, resist not thine enemies. Destroy thy passions, for they are the armies of *Mara*, and scatter them as the elephant scatters a bamboo hut. Lust not, desire nothing ; all the objects thou pinest for, the world over, could no more satisfy thy lust, than all the sea-water could quench thy thirst. That which alone satisfies man is wisdom—be wise. Be ye without hatred, without selfishness, without hypocrisy. Be tolerant with the intolerant, charitable and compassionate with the hard-hearted, gentle with the violent, detached from everything amidst those who are attached to all, in this world of illusion. Harm no mortal creature. Do that which thou wouldest like to see done by all others.

তথাগত বুদ্ধ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে মার্গের দেশনা দিয়াছেন—তাহার নাম 'মজ্ঝিমা পটিপদা' (the middle way.) It is neither the habitual practice of sensuality (a low un-worthy way) nor the habitual practice of asceticism. There is a middle path, O Bikkhus, avoiding these two extremes—a path that bestows understanding, which leads to peace of mind, to the higher wisdom, to Nirvana. (Buddhist suttas. pp 146—8).

তত্র ভিক্‌খবে! যায়ং মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্‌খুকরণী ঞানকরণী উপসমায় অভিঞ্ঞায় সংবোধায় নিব্বাণায় সংবত্তাতি অদুক্‌খো এসো ধম্মো অনুপঘাতো অনুপায়াসো অপরিলাহো সম্মাপটিপদা—তস্মা এসো ধম্মো সরণো—
মজ্ঝিমনিকায়, ১৩৯ সূত্ত

সেই গীতার কথা—

যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥—৬।১৭

'আহার বিহার, নিদ্রা জাগরণ—সমস্ত কর্ম্মে যুক্ত (harmonised) হইতে হইবে—'অত্যন্ত' (extreme) বর্জ্জন করিতে হইবে—কারণ সর্ব্বম্ অত্যন্ত গর্হিতম্।

লক্ষ্য করা উচিত, বুদ্ধদেবের যে 'মজ্ঝিমা পটিপদা' (Middle Path) উহাই গ্রীক্‌গুরু এরিস্‌টটলের (Aristotle's) Doctrine of the Mean। রোমান্ প্রবচন (Proverb)—elephas medius tutissimus (the middle elephant is the safest) ইহারই অনুরূপকথা।

বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের মত ইহলোক-সর্ব্বস্ব ছিলেন না—তিনি পরলোক, স্বর্গ-নরক মানিতেন। তিনি বলিতেন, পুণ্য-পাপের ফল ইহলোকেই নিঃশেষ হয় না। ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিংলোকে পরম্হি চ (লোকবগ্‌গো) আর যে পাপকারী—যে আত্মসুখান্বেষী হইয়া পরপীড়া দেয় ?

অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ ন লভতে সুখং—দণ্ডবগ্‌গো

অর্থাৎ যে পাপী, তাহার 'ইহামুত্র' (ইহলোক-পরলোকে) দুঃখ—এবং যিনি পুণ্যকারী, তাঁহার ইহামুত্র সুখ।

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি, পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো-উভয়ত্থ মোদতি ॥—যমকবগ্গো

এক কথায়, ইহলোকেই দেহের সহিত সব অবসান হয় না—দেহান্তে (পেচ্চ=প্রেত্য) যে পরলোক-গতি হয়, সুখাস্পদ হইলে তাহার নাম স্বর্গ এবং দুঃখাস্পদ হইলে তাহার নাম নরক।

সগ্গং সুগতিনো যন্তি নিরয়ং পাপকম্মিনো—পাপবগ্গো
কায়স্স ভেদা দুপ্পঞ্ঞো নিরয়ং সো পপজ্জতি।—দণ্ডবগ্গো
অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি—নিরয়বগ্গো
নিরয়=নরক (Hell)*

কারণ, বুদ্ধদেবের মতে 'our present existence is not our whole life, it is only a tiny section of our life. (George Grimm)। অতএব যদি পরলোক (Survival after Death) থাকে, তবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কিরূপে 'direct his efforts toward the utmost possible unrestrained satisfaction of his sense-cravings but must also take into account the consequences that in a future life may follow upon such brutal egoism (Ibid)—কিরূপে শ্রেয়ঃ বর্জ্জন করিয়া প্রেয়ঃ বরণ করিবেন ?

অন্যৎ প্রেয়ো অন্যদ্ উতৈব শ্রেয়ঃ—উপনিষদ্। অতএব ভোগের পথ ('Primrose Path of Dalliance') ঠিক নয়—ত্যাগের পথে বিচরণ করিতে হইবে—প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া নিবৃত্তিকে বরণ করিতে হইবে—কারণ,

অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী—বালবগ্গো

* মজ্ঝিম নিকায়ে এ অবস্থার আভাস দিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ;—Rather, Bikhus ! might this one-eyed turtle get its neck into the one-holed drum-net than a fool once sunk into this depth, come again into the world of men. But why so ? Because there is monks ! no just conduct, no straightforward conduct, no whole-some acting, no charitable acting.

অর্থাৎ বুদ্ধদেব প্রেয়ঃবাদী (Hedonist) নন, তিনি শ্রেয়ঃবাদী। যদি পরলোক থাকে, তবে ইহলোককে সর্ব্বস্ব করিলে চলিবে কেন ? সেই জন্য বুদ্ধদেব জীবকে পরলোকের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন—

উপনীত বয়ো চ দানি সি × ×
পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি—মলবগ্গো

'মৃত্যু সন্নিকট—শীঘ্রই ভবপারে যাত্রা করিতে হইবে। হে যাত্রি! সে মহাযাত্রার জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করিলে ?' প্রবৃত্তিমার্গী ইহলোকের ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত ('the materialist lives for the moment') কিন্তু দীর্ঘদর্শী বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে 'the momentary pleasure is as nothing'—তাঁহার লক্ষ্য পামোজ্জ'—অন্তহীন সুখ, পরা শান্তি, অনুত্তর যোগক্ষেম।

ততো পামোজ্জবহুলো দুক্খস্সন্তং করিস্সতি—ভিক্খুবগ্গো
ফুসন্তি ধীরা নির্ব্বাণং যোগক্খেমং অনুত্তরং—অপ্পমাদবগ্গো

অতএব His gospel is not self-indulgence but self-restraint—তাঁহার লক্ষ্য ভোগ নয়, ত্যাগ—সংযোজন নয়, বিসর্জ্জন—অর্জ্জন নয়, বর্জ্জন—আদান নয়, প্রদান—কামের প্রচয় নয়, 'তন্হা' (তৃষ্ণার) বিজয়—মমত্বের প্রসার নয়, অহংত্বের সংকোচ।

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্স নত্থি মমায়িতং—ভিক্খুবগ্গো

অর্থাৎ 'not enhancement but effacement of Egoism'.

সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত-পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং—বুদ্ধবগ্গো

'পাপের অকরণ, কুশলের (পুণ্যের) অনুষ্ঠান ও চিত্তের নির্ম্মলীকরণ—বুদ্ধের ইহাই অনুশাসন'। তাঁহার উপদেশ এই :—

যস্স পাপং কতং কম্ম কুসলেন পিথীয়তি।
সোহমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তোব চন্দিমা ॥—লোকবগ্গো

'যাঁহার কৃত পাপ কর্ম্ম, কুশল (পুণ্যকর্ম্ম) দ্বারা আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই লোক উদ্ভাসিত করেন।' তাঁহার উপদিষ্ট যে

পঞ্চশীল—যাহা শ্রাবক শ্রমণ সকলেরই অনুষ্ঠেয় এবং যাহার সৌরভকে তিনি অনুত্তর বলিয়াছেন—

চন্দনং তগরং বাপি উপ্পলং অথ বস্‌সিকী।
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো ॥—পুপ্‌ফবগ্‌গো

(বস্‌সিকী = চামেলি)

—ঐ পঞ্চশীল সমস্তই Moral Precepts.

প্রাণিহত্যা, মিথ্যাকথা, পরদার, মদ্যপান, পরস্বগ্রহণ—এই সকল দুরাচার বর্জ্জন করিতে হইবে—

যো পাণম্ অতি পাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি।
লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি ॥
সুরামেরেয় পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি।
ইধেবম্ এসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো ॥—মলবগ্গো

(পাণম্ = প্রাণম্)

এবং ইন্দ্রিয়ের বেগ সংবরণ করিয়া, চিত্তের বহির্মুখ বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া, —কামনা বাসনা তন্‌হার সংযম করিয়া অন্তস্থ হইতে হইবে।

চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্‌হায় সংবরো
কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো।
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো ॥—ভিক্‌খুবগ্‌গো

অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায় বাক্য মন—সর্ব্বত্র সংবৃত হও। সংবরণ, সংযমন, সংকোচন, সংমার্জ্জন—ইহাকেই জীবনের ধারা কর—কারণ, ইহাই দুঃখহানির উপায়।

সব্বত্থ সংবুতো ভিক্‌খু সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

দেখ, সংগ্রামে সহস্রগুণিত সহস্র যোদ্ধাকে জয় করা অপেক্ষা আত্ম-জয় (self-mastery) শ্রেষ্ঠ—যিনি আত্মজয়ী, তিনিই জেতৃতম—কারণ, অত্তা হি কিল দুদ্দমো।

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যম্ অত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো ॥—সহস্‌সবগ্গো

বুঝিয়া চল—জীবনতরীকে ভারি করিও না—Lesson your denominator (Carlyle)—সেচন দ্বারা ঐ নৌকাকে লঘু ক'র—তবেই অনায়াসে পরপারে উপনীত হইবে।

সিঞ্চ ভিক্‌খু! ইমংনাবং, সিত্তা তে লহুমেস্‌সতি—ভিক্‌খুবগ্‌গো

মুঞ্চ পুরে, মুঞ্চ পচ্ছতো, মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ—তন্‌হাবগ্‌গো

'সামনে, পিছনে, মধ্যে—যাহা কিছু সমস্ত বর্জ্জন, বিসর্জ্জন ক'র—হে ভবপারের যাত্রী!'—তবেই ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।

সর্ব্বদা সতর্ক রও—প্রমত্ত হইও না—মা চ পামদো (ভিক্‌খুবগ্‌গো) —অপ্রমাদরত হও—Cultivate ceaseless mindfulness.

অপ্পমাদরতা হোথ সচিত্তম্ অনুরক্‌খথ——নাগবগ্‌গো

সাবধান! জলপ্লাবন আসিয়া যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লয়, কামের প্লাবন অসতর্ক তোমাকে যেন সেরূপ ভাসাইয়া লয় না।

তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তংগামং মহোঘো ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি—মগ্‌গবগ্‌গো

(পুত্তপসুসম্মত্তং = পুত্রপশুসংমত্তং)
উট্ঠানেন 'পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ।
দীপং করিয়াথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥—অপ্পমাদবগ্‌গো

'প্রবুদ্ধ, অপ্রমত্ত, সংযত, দান্ত হইয়া মেধাবী ব্যক্তি দ্বীপ (refuge) রচনা করেন, যেন বন্যা তাঁহাকে ভাসাইয়া না লয়।'

এই অপ্রমাদের উপর বুদ্ধদেব বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন—

অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং ব রক্‌খতি।
× × অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং।

(পপ্পোতি = প্রাপ্নোতি)

'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত সযত্নে রক্ষা করেন।' 'অপ্রমত্ত ব্যক্তি ধ্যানযোগে বিপুল সুখ লাভ করেন।' এমন কি, দেহত্যাগের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের শেষ বাণী এই অপ্রমাদ সম্পর্কে।

হন্দ দানী ভিক্‌খবে! আমন্তয়ামি বো
বয়ধম্মা সঙ্খারা—অপ্পমাদেন সম্পাদেথ ॥

বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট যে 'ব্রহ্মচরিয়', তাঁহার নির্দিষ্ট যে scheme of life,—যদি এককথায় তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে বলিতে হয় উহা বিশুদ্ধি-মার্গ, উহার লক্ষ্য Sanctification। যিনি ঐ লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে 'বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং' (the highest has been lived), যিনি বলিতে পারেন Consummation Est ('It is finished')—তাঁহার 'নিব্বানম্ অন্তিকে'—তিনি 'বুদ্ধ' হইয়াছেন, তিনি 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছেন।

অসত্তং সু-গতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।
সঙ্গাতিগং বিসংযুক্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।
উক্খিত্ত পলিঘং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥—ব্রাহ্মণবগ্গো

'যিনি অনাসক্ত, সুগত, বুদ্ধ, যিনি সঙ্গাতীত, মায়াতীত, বিসংযুক্ত, তাঁহাকেই বলি 'ব্রাহ্মণ'।' বৃহদারণ্যক-উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে আমরা এই কথাই শুনিয়াছিলাম।

নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি,
—বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২৩

'পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।' যিনি 'ব্রাহ্মণ' তাঁহার চর্য্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১)—By living as chance may determine অর্থাৎ তিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (গীতা)—বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদে যাহাকে 'আহারে চ অনিস্সিতো (অনিঃসৃতঃ)' বলিয়াছেন।

ঐ 'ব্রাহ্মণে'র মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম্মদ্বারা উপচিত বা অপচিত হন না' অর্থাৎ তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক ৩।১।৩

বুদ্ধদেব এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

কারণ, পদ্মপত্রে যেমন জল-স্পর্শ হয় না, ব্রাহ্মণে তেমনি কর্ম্মের সংশ্লেষ হয় না। 'পদ্মপত্র-মিবাম্ভসা' (গীতা)।

Just as O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water; just so, Brahmin, I remain.—অঙ্গুত্তর নিকায় II.

অতএব 'ব্রাহ্মণ' হওয়া বেশ সুকঠিন! বুদ্ধদেবের শিক্ষা এই যে, 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইলে 'শ্রাবক'কে ওক (গৃহ) হইতে অনোকে গিয়া (ওকা অনোকং আগম্ম), অনাগারিক 'শ্রমণ' হইয়া, সংসার ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হইবে, ভিক্ষু হইতে হইবে।

যোধ কামে পহত্বান অনাগারে পরিব্বজে
অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি, অনাগারে হি চূভয়ং।
অনোক-সারিং অপ্পিচ্ছং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥—ব্রাহ্মণবগ্গো

ভিক্ষু বিবেকে যত্ন করিবেন (বিবেকে যথ দূরমং) এবং 'ঞান-ঝান-পঞ্‌ঞা'-পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান ও প্রজ্ঞায় সুস্থিত হইয়া সম্বোধি লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

যেসং সম্বোধি-অঙ্গেসু সম্মাচিত্তং সুভাবিতং—পণ্ডিতবগ্গো

তিনি নিন্দাস্তুতি তুল্যমূল্য করিবেন—যেমন একঘন শৈল বাতে প্রচলিত হয় না, এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্‌জন্তি পণ্ডিতা (পণ্ডিতবগ্গো)

সুখকে ও দুঃখকে সমান বোধ করিবেন—

সুখেন ফুট্ঠা অথবা দুক্খেন।
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তি॥

কারণ,—

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি, পথামন্তীং ন সোচতি।
সংজাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ *—উদান, ১।৮

* The coming does not make him glad,
The going does not make him sad,
The monk from longing all released,
Him do I call a Brahmana.

—এবং পুণ্যপাপ-বিহীন হইবেন।

পুঞ্ঞ পাপ পহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং—চিত্তবগ্গো

তখন জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতি তাঁহার নিকট অভিন্ন হইবে—

উপসন্তো সুখং সেত্তি হিত্বা জয়পরাজয়ং—সুখবগ্গো

কারণ, তিনি এতদিনে কাম-লতাকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া (তংচ দিব লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায় ছিন্দিথ)—এবং 'কামতো বিপ্পমুত্ত'—কাম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়া অকাম, নিষ্কাম হইয়াছেন।

বারি পোক্খর পত্তেব আরগ্গেরিব সাসপো।
যো ন লিপ্পতি কামেসু তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

—পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচ্যগ্রে সর্ষপের ন্যায়, কামেতে 'ব্রাহ্মণ' লিপ্ত হয় না। কারণ, যিনি 'ব্রাহ্মণ', যিনি 'তন্হায় বিপ্পমুত্তস্স'—যিনি 'বীততন্হো অনাদানো'—তিনি রাগংচ দোসঞ্চ পহায় মোহং—রাগ, দ্বেষ ও মোহের অতীত হইয়াছেন। *

যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতঃ।
সাসপোরিব আরগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥
(মক্খ = কাপট্য)

কারণ, তিনি সর্ব্বধর্ম্মে অনুপলিপ্ত হইয়া (সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো), সমস্ত আশ্রব (ক্লেশের) ঊর্দ্ধে উঠিয়া, কৃতকৃত্য, অনাসব হইয়াছেন (যস্সাসবা পরিক্খীনা)—

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং।
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

তিনি অনঙ্গন (নিরঞ্জন)—(নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গনো), অনপেক্ষ (অনপেক্খিনো কামসুখং বিহায়) হইয়া নিরাশী, নিবৃত হইয়াছেন।

আসা যস্স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।
নিরাসয়ং বিসংযুক্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং।
সাদানেসু আনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

* অরাগো অদোসো অমোহো অনঙ্গনো অসংকিলিট্ঠ চিত্তো—মজ্ঝিমনিকায়, Fifth Discourse

তিনি এমনই অনাদান, জোতিষ্মান্ (খীনাসবা জুতীমন্তো) যে, দেবতারা, এমন কি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাও তাঁহার মহিমার প্রশংসা করেন।

দেবাপি তং পসংসন্তি ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো।—কোধবগ্গো

'ব্রাহ্মণ' তিনি—যিনি সঙ্গাতিগ, যিনি সর্ব্বসংযোজন-বিমুক্ত (freed from all fetters), যিনি বিসংযুক্ত—যাঁহার

যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি
বীতদ্দরং বিসংঞ্ঞুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

—এক কথায় যিনি অকিঞ্চন (হিত্বা কামে অকিঞ্চনো—যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং)—যাহার পূর্ব্বে, পশ্চাতে বা মধ্যে কিছু নাই—তিনিই ব্রাহ্মণ।

যস্স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

এরূপ ব্রাহ্মণের নির্ব্বাণ সন্নিকটে (স বে নিব্বানসন্তিকে)—তিনি সেই অভূত অজাত অচ্যুত অকৃত অমৃত পদে, সেই প্রামোজ্য-বহুল বিপুল সুখে, সেই 'ভূমানন্দে' নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

ততো পামোজ্জবহুলং দুক্খস্সন্তং করিস্সসি—ভিক্খুবগ্গো

যে বুদ্ধদেবের এই মত, এই পথ—যাঁহার এই দীক্ষা-শিক্ষা, এই লক্ষ্য-ধ্যেয়, তিনি যদি নাস্তিক হন, তবে—? কিন্তু 'সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'। যাঁহারা 'Advocatus Diaboli', তাঁহাদের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। এই সকল তথা-কথিত আস্তিকেরা বুদ্ধদেবের বিপক্ষে কি বিবিধ নাস্তিকতার অভিযোগ আনয়ন করেন, আগামীবারে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিলেত-সম্বন্ধে রঙ্গ চড়িয়ে প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষে বড় কঠিন। ও দেশের সভ্যতা কখনই তেমন রপ্ত করতে পারি নেই। পারি নেই বলেই, হয়ত, আমার মনের ভাব কতকটা সেই কথামালার আঙ্গুর-লুব্ধ শেয়ালের মত। কপালের জোরে ও আঙ্গুরে অনেকেই মিষ্টরস পেয়েছেন। আমি সে রসে বঞ্চিত।

তবু পাঠক যেন দয়া ক'রে ধ'রে নেবেন না যে আমার মনের অবস্থা, "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।" সাহেবদের অনেক গুণ আমার টেরা চোখকেও এড়াতে পারে নেই। সেগুলোর কথা অবশ্য বলব। তবে সেখানেও গলদ অনেক। আমি যা দেখেছিলাম, সে সব ত আজ নেই। শুনতে পাই, ইংরেজ তার সাবেক রোষ্ট বিফ্ ও বিয়ারের সভ্যতা ছেড়ে snacks and cocktail-এর পন্থা নিয়েছে। Snacks and cocktail-এর বাঙ্গালা তরজমা করতে পারলাম না। চাট ও মদ বললে অনেকে চটবেন। মোটের উপর, বোধ হয় আমার এখনকার কথা বেশী কিছু না বলাই ভাল, কেননা পুরানো মানুষ পুরানো কথা লিখতে বসেছি।

আমাদের কালে ইংরেজ সত্যিই Punch পত্রিকার জন বুলের মতন ছিল। পোষাকের কথা বলছি না, কারণ ও পোষাক তখন চ'লে গেছে। কিন্তু চরিত্রে বিশেষ কিছু তফাৎ হয় নেই। একটু বুদ্ধিহীন, একটু হাঁদা, আর পুরোদস্তুর একগুঁয়ে। চটক নেই, লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ে না, তবে এককথার মানুষ। তাদের বাড়ী ঘর দোর, তাদের সমাজ, তাদের রাষ্ট্র সব নিরেট পোক্ত ভিতের উপর তৈরী। তোতাবুলি দরকার মত আওড়ায় কিন্তু হুজুগে প'ড়ে নিজের নাক কান কাটে না। এক কথায় অজ-bourgeois, বিংশ শতকের জুজু।

কিন্তু এই ইংরেজকে আমার ভাল লেগেছিল। এদের ঘর-বাড়ী ছিল। এরা হোটেলে হোটেলে ঘুরে ব্যাণ্ডের তালে খানা খেয়ে বেড়াত না। আড্ডায় আড্ডায় নিত্য নূতন উত্তেজনা খুঁজে বেড়াতে হত না এদের। বনেদী

ঘরে পর্য্যন্ত কতকটা ছা-পোষা গেরস্তের ধরণ-ধারণ ছিল। বাড়ী ছিল, বাড়ীর উপর টান ছিল, তাই এদের অতিথি-সৎকারও আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল। খানার টেবিলে গিন্নী সামনে একটা হাঁড়ি নিয়ে বসে সুরুয়া পরিবেশন করতেন, কর্ত্তা রোষ্ট মাংসের চাঙ্গড়া থেকে বেছে বেছে ফালি কেটে সবায়ের পাতে দিতেন। চায়ের টেবিলে অতিথির জন্য একটা না একটা কিছু ঘরের মেয়েদের তৈরী খাবার থাকত। আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরিচিত একটা হৃদ্যতা, আনন্দের ভাব সে দেশেও সর্ব্বত্র দেখতে পেতাম।

কলেজে রেন-গিন্নী স্বয়ং চা ঢেলে দিতেন, সুরুয়া পরিবেশন করতেন, প্লেটের উপর খাবার তুলে দিতেন। আমার ব্যারিষ্টারি আড্ডায় (Gray's Inn) চার চার জনে এক এক Mess করে খেতে বসতে হত। তার মধ্যে একজন হত কাপ্তান। সেই অতিথি-সৎকারের অভিনয় করত। নিতান্ত ভেটেরাখানা না হলে চাকর দিয়ে খাবার পরিবেশন হতনা। অবশ্য রাজা-রাজড়ার কথা আলাদা। তাঁদের বাড়ীতে কি হত আমি কোথা থেকে জানব!

নিত্যকার ব্যবহারেও ইংরেজ ভদ্রলোকের আদব-কায়দা আমার বড় ভাল লেগেছিল। ফরাসীদের মতন কথায় কথায় মাথা নীচু করা কি টুপি তোলা, চোস্ত জবানে আলাপ করা এদের না থাকলেও একটা গম্ভীর নির্ব্বাক খানদানী চাল সব কাজে দেখা যেত।

ইংরেজের আর একটা গুণ নিতান্ত অন্ধ ছাড়া সবাই দেখতে পেত। সেটা ওদের অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য্য। ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ, আমাদের কাব্যেই আছে, ঘরে নেই। ওদের ভদ্রসমাজে কিন্তু শতকরা পঁচিশ জনের বেলা ঐ বর্ণনা খাটে, অন্ততঃ আমার সময়ে খাটত। তাদের পাশে আমাদের অধিকাংশ কৃষ্ণকায়কে হাস্যাস্পদ দেখাত, বিশেষ ক'রে যখন আখাড়ায় কি সমুদ্রের ধারে গা খুলতে হত। এমন কি জার্ম্মান ও ফরাসী সাহেব যারা সব রকমে ইংরেজের সমকক্ষ, তারাও ঐ বিষয়ে ইংরেজের তুলনায় অনেক নিরেস। কেন যে এমনটা হয়েছে বলা শক্ত। অনেক ইংরেজের মুখে শুনেছি যে এই দৈহিক আদর্শ তারা সাবেক গ্রীকদের কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু এত লোক থাকতে শুধু এরাই গ্রীক আদর্শ পেলে কোথা থেকে?

আমি ত ইংরেজের রূপ নিয়ে এতটা উৎসাহ দেখাচ্ছি, কিন্তু একজন

সাহেব নিজে কি ব'লে গেছেন সেটাও প্রণিধান-যোগ্য। সেকালের নামজাদা মুসাফের লিভিংষ্টোন সাহেব কাফ্রীদেশের জুলুদের দেখে লিখে গেছেন, এদের শরীরের গড়ন এত চমৎকার যে এদের সাক্ষাতে পোষাক খুলতে আমার ভয়ানক লজ্জা করে।

পুরুষের কথা যখন এত বল্লাম, মেয়েদের কথাও কিছু বলতে হয়। তবে আমার ঘাড়ে একটা বই মাথা নেই। কালো চোখের সঙ্গে নীল চোখের তুলনা আমি করতে পারব না। কালো কুন্তলের সঙ্গে লাল হলদে কুন্তলের তুলনা করতে আমি অক্ষম! কবির কথায়, "তোমরা সবাই ভালো"। তবে এইটুক শুধু বলব, যে সে যুগের ইঙ্গসুন্দরীদের চলা-ফেরাতে একটু আড়ষ্ট ভাব ছিল, একটু যেন কমনীয়তার অভাব নজরে পড়ত। এ বিষয়ে তাঁরা ফরাসী সুন্দরীদের চেয়ে অনেক খাটো ছিলেন। তেমনই, complexion বা চামড়ার সৌন্দর্য্যেও ইংলণ্ডীয়ারা হার মানতেন। ছোট জাতের ফরাসিনীদের চামড়াও এদের চেয়ে বেশী চিকন মোলায়েম ছিল। একথা সবাই নাও মানতে পারেন। যাঁদের চোখে চামড়ার রঙটাই সব, তাঁরা অবশ্য ইংরেজকে prize দেবেন, কেননা বেশীর ভাগ ফরাসিনীর রঙ ঠিক সাদা নয়, খুব ফিকে একটু গজদন্তের আভা আছে। বর্ণ-সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত কতকটা কাফ্রীদের মতন। বিকট সাদা রঙ আমি দেখতে পারি না। তার চেয়ে নিখুঁত কালোও আমার ঢের ভাল লাগে। যখনই ইংরেজের সঙ্গে গা খুলে ঘুরেছি, তখনই মনে হয়েছে যে ওদের ঐ সুন্দর সুঠাম শরীর আরও কত সুন্দর হত যদি অমন ফ্যাকফেকে সাদা না হত। রোদে পুড়ে ওদের মুখের রঙ কেমন চমৎকার হয়ে যায়, গাটা কেন হয় না!

কি কথা বলতে কোথায় এসে পড়লাম! স্ত্রীলোকের রূপের কথা হচ্ছিল। সে সৌন্দর্য্যের আদর্শ যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে। মরালগামিনী বললে এখন আর বোধহয় কোন অর্থবোধ হয় না। চকিতনয়নী কথাটাই লোপ পেয়েছে, কেননা আর ত কেউ চকিত হয় না! লতার মত দেহযষ্ঠি, সেও আর শোনা যায় না। এক রইল লাঠির মত দেহযষ্ঠি। সেটা যে যায় নেই, তা আমরা পথে ঘাটেই দেখতে পাই। বিলেতের কথা বলছি, সুতরাং এদেশের কেউ রাগ করবেন না।

রূপের কথা বলতে গেলে এটা ভুললে চলবে না, যে সভ্যজগতে রূপ অনেকটা বেশ-প্রসাধনের উপর নির্ভর করে। আমার সময়ে পুরুষের কাপড় এক ইংরেজ দরজীরাই কাটতে জানত। তেমনই আবার মেয়েদের কাপড় পারিস ছাড়া কোথাও হত না। ভিয়েনাতে কতক কতক হত। এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। যখন মার্কিন আর স্পেনে লড়াই বাধল আর স্পেনের রাজা হেরে যেতে লাগলেন, তখন তার উপর ফরাসীদের দরদ উথলে উঠল। পারিসের খবরের কাগজগুলো দিবারাত্র পৃথিবীকে এই বোঝাতে লাগল, যে ভুঁইফোড় মার্কিনরা জবরদস্তী ক'রে একটা নির্বিরোধী বনেদী বংশের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। আর তাদের বেইজ্জৎ করছে। মার্কিন কাগজগুলো চটে ফরাসীদের শাসাতে আরম্ভ করলে, যে পারিস সহরের দরজীরা মার্কিন অন্নে পরিপুষ্ট, এইবার তাদের জব্দ করব, আমরা ভিয়েনাতে কাপড় করাব। ফরাসী কাগজওয়াল্লারা পালটা জবাব দিলে, যে মার্কিনদের যা গড়ন ওদের গায়ে কাপড় বসান পণ্ডশ্রম, মজুরী পোষায় না। যাহোক এ সব অসভ্য কথা কাটাকাটির কোন ফল হল না, কেননা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কিছু দিন পরেই মার্কিন সুন্দরীরা কাপড় করাতে দলে দলে পারিসেই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলেন। ভিয়েনার কিছু সুবিধা হল না।

আমার নিজের গল্প আবার বলি। শরৎকালে মাস চারেকের জন্য কলেজ বন্ধ হয়। ছুটিটা কোথায় কাটাব, এই নিয়ে নানা জল্পনা করতে লাগলাম। বাবার পরিচিত এক ইংরেজ পরিবার নিমন্ত্রণ করলেন, তাঁদের কাছে দূর পাড়াগাঁয়ে মাসখানেক কাটাবার জন্য। কিন্তু যেতে সাহস হল না। বিলেতে ব'সে ইঙ্গ-ভারতীয় আবহাওয়া সহ্য করতে পারব কিনা, কি বলতে কি ব'লে ফেলব, তারাই বা কি ভাববে, কাজ নেই, ভেবে নিমন্ত্রণ নিলাম না। ফরাসী ভাষা শিখছিলাম, সেটা রপ্ত করার মতলবে পারিস চ'লে গেলাম। কপাল জোরে এক মধ্যবিত্ত ফরাসী পরিবারের মাঝে থাকবার সুযোগ মিলল। খুব ভাল লাগল। তাদের আত্মীয় স্বজন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। মোটের উপর দেখলাম, যে ফরাসীদের চাল-চলন একটু একটু আমাদের মতন। হো-হো ক'রে হাসে, চেঁচিয়ে কথা কয়, ভুঁড়ি দুলিয়ে চলে, পেটুকের মত খায়। কালো সাদার ভেদজ্ঞান ওদের ইংরেজের মত প্রখর নয়। ইংলণ্ডে আমরা

রাস্তায় বের হলে যেমন সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত; ছোঁড়াগুলো 'Blackie Blackie,' ব'লে চেঁচাত প্যারিসে তা মোটে দেখি নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের কি স্পেনের অনেক লোকের মুখের রঙ্গ এত কালো বা পাটকিলে যে হঠাৎ তাদের সঙ্গে ভারতীয় লোকের তফাৎ বোঝা যেত না। তাই বোধ হয় আমাদের ততটা আজগুবী দেখাত না ওদের চোখে। তবে সহ্যের একটা সীমা আছে ত! একদিন এক দল কাফ্রী মুসলমান তাদের স্বদেশী পোষাক পরে সরকারী বাগানে বেড়াচ্ছিল আর খুব হাল্লা করে নিজের ভাষায় কথা কইছিল। এক দল রাস্তার ছোঁড়া খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে, তারপর তাদের পিছু নিলে আর হাততালি দিয়ে 'boule de neige' (snow ball), ব'লে ঠাট্টা করতে লাগল। কাফ্রীরা চুপ ক'রে গেল।

ইংলণ্ডেও যে আমাদের অপমান করবার ইচ্ছাতে কালা বলে ড্যাকত, তা আমার মনে হয় না। অত বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলেও, ইংরেজের তখনকার দিনে বড্ড কুনো ভাব ছিল। একটু কিছু আজগুবি দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। বোধহয় বুঝতও না যে ওটা অভদ্রতা। আমাদের কেউ কেউ কিন্তু এতটা না বুঝে ভয়ানক চ'টে উঠতেন। সিং বলে আমার এক বিশালকায় বন্ধু ছিল। অত্যন্ত ভাল মানুষ। ইংরেজী বেশী বলতে পারত না। জিমিদার ঘরানার আওলাদ, মেট্রিক কোনক্রমে পাশ হয়েছে, ইজ্জৎকে লিয়ে তার লায়ার হওয়ার খাহেশ, নইলে ঘরে টাকার অভাব নেই। দুজনে আমরা রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় এক বছর কুড়িকের কুলী ছোঁড়া "কালা" ব'লে ডেকেছে। যেই ডাকা, কি সিংজী এক হাত বাড়িয়ে বেচারার ঘাড় ধ'রে তাকে শূন্যে তুলে ফেললে। তুলে নানা রকম গালিগালাজ করতে লেগে গেল। আমি বন্ধুর হাতে পায়ে ধ'রে কত কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে বাড়ী নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করলে না যে লোকটা ইচ্ছা করে অপমান করতে চায় নেই।

আর এক দিন হল কি, আমরা তিন জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি উলউইচ শহরে। তিন জনেরই ঘোড়সওয়ারী পোষাক, হাতে চাবুক। এক শুঁড়ীর দোকানের পাশ দিয়ে চলেছি। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড navvy (কুলী মজুর) ব'লে উঠল, "হ্যালো ব্লাকী!" আমাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে

বেঁটে, রোগা, তিনি তৎক্ষণাৎ "হারামজাদা!" ব'লে গর্জ্জন ক'রে লোকটার মুখের উপর মারলেন এক চাবুক। সাদা একটা দাগ প'ড়ে গেল বেচারার লাল টকটকে মুখে। সে দু তিন বার ঢোক গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এ কি রকম ব্যবহার, এ কি জুলুম!" লোকটা ইচ্ছা করলে আমাদের তিন জনকেই ধরাশায়ী করতে পারত পাঁচ মিনিটে। যাই হোক, আমি তার পিঠ চাপড়ে একটা শিলিং বকশীস দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। সে বার বার বললে "আমি কি দোষ করেছি, কি দোষ্ করেছি?" আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল এই ব্যাপার নিয়ে। তিনি আমায় কাপুরুষ, দেশদ্রোহী ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন।

আর একদিন, দূর দেহাতে আমি অনেকখানা বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ে ফিরছি, এমন সময় দেখি এক চাষা তার গাড়ীতে ঘাস বোঝাই ক'রে চলেছে। আমি বললাম, "আমাকে গাঁয়ে পোঁছে দেবে হে?" সে টপ ক'রে লাফিয়ে ভুঁইয়ে নেমে টুপি তুলে বললে, "গুড্ ইভনিং ব্লাকী। আসুন, নিশ্চয় পোঁছে দেব।" লোকটা আমাকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিলে, এক পয়সাও নিলে না। কি করে মনে করব যে সে আমায় অপমান করবার জন্য কালা আদমী বলেছিল?

আর এক রকমের একটা গল্প বলি। সেখানেও পাঠক দেখবেন যে অপমান করার চেয়ে ছেলেখেলা করবার ইচ্ছাটাই বেশী। আমরা সব খানা খাচ্ছি আমাদের Inn-এ। আমার বন্ধু সিং আর আমি এক মেসে বসেছি। অদূরে এক মেসে পল পিটার পিলে নামে এক মাদ্রাজী বন্ধু খাচ্ছেন। পিলে ভদ্রলোকটী খুব কালো, ছোট্ট, আর পেট মোটা। লম্বা গলাবন্ধ কোট পরতেন। মাথায় খুব জলজ্বলে লাল সোনালী পাগড়ী। মুখটি খুব বুদ্ধিমানের মত নয়। মহাজন সভার প্রতিনিধি হয়ে বিলেতে এসেছেন। সেই সুযোগে ব্যারিষ্টার হওয়ার কাজটাও কতক এগিয়ে রাখছেন। সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় খুব অমায়িক হাসি হাসতেন। ইংরেজ ছেলেরা তাঁর যে নামটা দিয়েছিল সেটা খুব সম্মানসূচক নয়। হঠাৎ একজন ছোকরা পিলের পাগড়ীটা টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে চালিয়ে দিলে আর একজনের কাছে। দেখতে দেখতে পাগড়ী চ'লে গেল বহু দূর। বেচারা দাঁড়িয়ে উঠে, "My turban, please" বলে কাকুতি মিনতি করলে লাগল। সবাই হেসে উঠল। কিন্তু

বন্ধু সিং রক্তচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, রোস্ট্‌ কাটার ছোরাটা হাতে নিয়ে অস্ত্র তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার পাগড়ীতে যদি কেউ হাত দিত ত,—" পিলের পাগড়ী ফিরে এল দু মিনিটে। আমি সিংজীর কোটের ল্যাজ ধ'রে টেনে বসিয়ে দিলাম। সে তখনও রাগে ফুলছে, "পাগড়ী খুলে নেওয়ায় আর মাথা কেটে ফেলায় তফাৎ কি!" আমি বললাম, "ঐ সব পাঁচরকম ভেবেই আমরা বাঙ্গালীরা পাগড়ী বাঁধি না।" তখন সিং হেসে উঠল। আমি সময় বুঝে বললাম, "সিং, তুই ফার্স্‌ বুঝিস্‌ না। সব তাতেই ট্রাজেডী দেখিস্‌।" সত্যি অপমান কেউ করেনা তা নয়। তবে রজ্জুতে সর্প ভ্রম ক'রে লাভ কি!

১৮৯৬ সালে লণ্ডনে আমি মোটর গাড়ী দেখি নেই। শুনেছিলাম যে যুবরাজ এডওয়ার্ডের একখানা আছে। পারিসে অনেকগুলি দেখলাম। কিন্তু এমন বেঢপ অদ্ভুত যান, যে আজকের দিনে লোকে রাস্তায় দেখলে হেসেই আকুল হবে। প্রায় টমটমের মত উঁচু গাড়ী, ছোট্ট বনেট্‌, খাড়া হয়ে বসে একটা লোহার দাণ্ডা ধ'রে চালাতে হয়। আর আওয়াজ, এখনকার ভদ্রবংশীয় মোটর সাইকেলও অত ফট্‌ফটাফট্‌ আওয়াজ করতে পারবে না। অধিকাংশ গাড়ীর আবার মাথার উপর রঙ্গীন চাঁদোয়া খাটান। সেই চন্দ্রাতপতলে দু'তিনজন জুলজুলে দাড়ীওয়ালা ছোকরা ফরাসীবাবু সিগারেট-মুখে গল্প করতে করতে চলেছে, দেখে ভারী মজা লাগত। সব গিয়ে জমা হত সরকারী বাগান—Bois de Boulogne-এ, এক বড় নামজাদা কাফীখানায়। পাশে এক কৃত্রিম জলপ্রপাত ছিল ব'লে তার নাম, Cafe de la Cascade। বড় বড় বাবুলোকের আড্ডা কিনা, তাই ওখানে খাবার দাবারের অসম্ভব দাম নিত। গরীব লোকের গতায়াত ছিল না। আমি কিন্তু রোজ ঐ কাফেতে গিয়ে জুটতাম, আর দুদণ্ড বসে একটা লেমনেড্‌ খেয়ে বাড়ী ফিরতাম। লেমনেডের দাম লাগত প্রায় এক টাকা। তখনকার দিনে বাইসিকেলও একটা সৌখীন চিজ ছিল। আমি প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একখানা লণ্ডন থেকে কিনে নিয়ে গেছলাম। সেটা থাকত পার্কেই এক দোকানে। রোজ সকাল বাসে ক'রে গিয়ে বাইসিকেল চ'ড়ে বাগানে ঘুরতাম। এই সূত্রে দুচারজন ফরাসী বাবুলোকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। এক আধবার তারা মোটরেও চড়িয়েছিল। মোটে ভাল লাগে

নেই। রূপ শব্দ ও গন্ধ, তিনটেই এমন বিকট যে রস কিছুই পেলাম না। তারচেয়ে আমার দুচাকার পা-গাড়ী চড়ে ঢের বেশী আনন্দ পেতাম।

আমি যাঁদের বাড়ীতে ছিলাম, তাঁরা খুব সাদাসিধে লোক। পরিবারে মাত্র একটী পুরুষ মানুষ। তিনি সবদিন বাড়ী ফিরতেন না, দেরী হলে কারখানাতেই রাত কাটাতেন। যাঁদের সঙ্গে আমি দিনযাপন করতাম, তাঁরা সবাই স্ত্রীলোক। সব চেয়ে বড় ছিলেন বুড়ী দিদিমা। তাঁর বয়স সত্তর। আর সব চেয়ে ছোট একটী কুড়ি বছরের মেয়ে, Suzanne। সবাই আমার বন্ধু ও মুরুব্বী ছিলেন। তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে আমার মতন নাবালকের ডিনারের পর বাড়ীর বার হওয়া উচিত নয়। কাজেই এ যাত্রা আমার পারিসের নাচখানা দেখা হল না। Champs d'Elysee দিয়ে যেতে যেতে সব নাচ ঘরের রোশনাইয়ের দিকে লুব্ধনয়নে চাইতাম আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম যে এবার পারিসে এলে হোটেলে থাকব। মাদাম, মাসীমা ও দিদিমাকে কিছু বলতে পারতাম না কিন্তু মেয়েটাকে খুব শাসাতাম। একদিন তাকে খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, "স্যু, এর শোধ আমি নেব। একদিন তোকে নিয়ে এমনি উধাও হয়ে যাব যে তোর দাদা কেঁদে মরবে।" স্যু একটু মুখরা ছিল। আর আমিও না ভেবে চিন্তে মূর্খের মতন তাকে আমার দেশের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, ইতিপূর্ব্বেই ব'লে ফেলেছিলাম। কাজেই সেও খুব মুখনাড়া দিত আমাকে। বলত, "রোস না, তোমার স্ত্রীকে সব লিখে দিচ্ছি। নাচঘরে যাওয়া বের করছি।" বুড়ী দিদিমার সঙ্গে আমার নিত্য রহস্য ছিল যে আমি তাঁকে আমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার ক'রে দেশে নিয়ে যাব। আমার বন্ধু রায়কে সাক্ষী মেনে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলাম যে আমাদের সমাজে বহু বিবাহ ধর্ম্ম-সম্মত। দিদিমাও থিয়েটারী ঢঙ্গে রোজ দুহাত তুলে উত্তর দিতেন, "বাপরে! সে আমি কিছুতেই পারব না, ভাই। যে বাঘ, ভালুক ও সাপের দৌরাত্ম্য তোমার দেশে!" এই রকম খোশগল্পে অমূল্য সন্ধ্যাবেলাগুলো কাটত। দিনের বেলা সারা পারিস চ'ষে বেড়াতাম, কখন একা, কখন রায়ের সঙ্গে। কোন কোন দিন রায়ের বন্ধু মাদমোয়াজেলও থাকতেন। আমার রাগ ধরল, "এইত মাদমোয়াজেল আমাদের সঙ্গে কেমন বেড়ায়, স্যু কেন যাবে না!" বললাম তাকে, "আজ

তোকে যেতে হবে আমাদের দলে বেড়াতে।” সে উত্তর দিলে, “মাকে জিজ্ঞাসা করব।” একটু পড়ে মাসীমা এসে বললেন, “ম্যসিঅ, আজ স্যু আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব। নিয়ে যাবে?” খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, “তার চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে।” গেলাম দুজনকে নিয়ে বেড়াতে সেদিন। আর কিন্তু কখনও স্যুকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলি নেই। একদিন তার দাদা আমাকে বেড়াতে বেড়াতে বললে, “মশায়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ফ্রান্সে কুমারী মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বেড়াতে যায় না। ইংলণ্ডের মতন ত নয়! এখানে লোকে বড় নিন্দা করে। আপনি বিরক্ত হবেন না।” আমি হেসে উত্তর দিলাম, “দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। আমি ত ইংরেজ নই। আমাদের দেশে আরও কড়াকড়ি।”

খেমটা নাচ ত দেখা হল না। কি করা যায়? একদিন এঁদের সবাইকে নিয়ে অপেরা দেখতে গেলাম। মেয়েরা ইভনিং পোষাক পরলেন বটে, কিন্তু গলা পর্য্যন্ত ঢাকা। ইংলণ্ডে শুনেছিলাম যে ফরাসী মেয়েরা ভয়ানক নির্লজ্জ, অর্দ্ধেক গা বের ক'রে খানায়, থিয়েটারে যায়। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, “পারিসে যাদিকে ঐ রকম গা খুলে বেরোতে দেখ, ওরা ভাল স্ত্রীলোক নয়।” সত্য মিথ্যা ঠিক করতে পারলাম না, তবে বুঝলাম যে, আমার বন্ধুরা bourgeois, যারা বিংশ শতকের ভাষায় “wallow in the mire of chastity”। কয়েক সপ্তাহ পারিস দেখার পর মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলাম যে ইংরেজ ও মার্কিন বাবুরা পারিসে যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সংসর্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান, তাদের ফরাসী ভাষায় আধ-সংসারী বলে, তাদের সঙ্গে গেরস্ত ঘরের মেয়েছেলের কোন সম্পর্ক নেই। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। এসব সেই যুগের কথা, যখন মার্কিন দেশের মহিলারা টেবিলের leg (পায়া) বলাটাও নির্লজ্জতা মনে করতেন। সে যুগ গেছে, আপদ গেছে!

অপেরা খুব চমৎকার লাগল। ওস্তাদী বিলেতী সঙ্গীতের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তবু বেশ উপভোগ করতে পারলাম। দুটো পালার একটা ছিল Cavallieri Rusticana। তার গান ও গৎ এত সুন্দর যে অতি বড় আনাড়ীও মোহিত হয়ে যায়। ইংলণ্ডের অপেরা আমি দেখি নেই।

কিন্তু কি প্রকাণ্ড অরকেষ্ট্রা পারিসের এই অপেরায়। নানা রকমের বেহালাই যে কত ছিল তার ইয়ত্তা নেই। একটা দৃশ্য ছিল সুইস্ দেশের পাহাড় ধ'সে পড়ার। এই ভীষণ ব্যাপারের সমস্ত আওয়াজটা অরকেষ্ট্রা থেকে বের হল। আর একটা দৃশ্য ছিল, একটী মেয়ে পাহাড়ের ঝরণায় জল ভরছে। তারও সমস্ত ধ্বনি নকল করলে অরকেষ্ট্রা। ছেলেবেলা থেকে স্বদেশী সংঙ্গীতকলার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বাবুর কল্যাণে। কিন্তু এ এক নূতন ব্যাপার। একটা নূতন আনন্দের দরজা খুলে গেল আমার সামনে। পরে একে একে সব বড় অপেরার পালাই শুনেছি।

একটা কথা এইখানেই আমি কবুল করি। ইংলণ্ডের অপেরা যেমন দেখি নেই, তেমনই ওখানের জাতীয় চিত্রশালা, বড় গির্জ্জা, রাজবাড়ী, কিছুই কখন দেখা হয় নেই। কিন্তু পারিসে এই ধরণের জিনিস সবই বারবার দেখেছি। এর বিশেষ কারণ কিছু দেখাতে পারি না। যে মানুষ চার বছরেও একবার ব্রিটিশ মিউজিয়ম কি ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার-এবী দেখে নেই, সে আর কৈফিয়ৎ কি দেবে! তার দুর্দ্দৈব!

পারিসে যত বড় বড় গির্জ্জা ছিল সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে আমার ভাল লাগত মাদেলিন গির্জ্জা। সেখানকার হাওয়াতে কেমন একটা শান্তির ভাব ছিল। একদিন করলাম কি, আমাদের মাসীমার সঙ্গে মেরী মূর্ত্তির সামনে নীরবে দুঘণ্টা হাঁটু গেড়ে ব'সে রইলাম। অদ্ভুত-দর্শন কিছু অদৃষ্টে হল না, কিন্তু মনটা বড় হালকা বোধ হতে লাগল। বাড়ীর পথে মাসী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি খৃষ্টান-মন্দিরে পূজা করলে, তোমাদের ব্রাহ্মণেরা চটবে না?” আমি উত্তর দিলাম, “আমাদের হিন্দু ধর্ম্মগুরুরা ওরকম একচোখো ন'ন।” সত্যি বললাম কি না, কে জানে!

আমার এই এক বাতিক ছিল। যেখানে সেখানে যখন তখন খুব জোর গলায় প্রচার করতাম, যে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম কোথাও নেই, এই ধর্ম্মের কোলে সকল পন্থা সকল বিশ্বাসেরই স্থান আছে। একবার জব্দও হলাম খুব। সেটা আরও বছরখানেক পরের কথা। জেনিভা সহরে এক ছোট হোটেলে ছুটী কাটাচ্ছি। হোটেলটী সহরের বড় বড় সরাইখানার মত নয়। ফ্রেঞ্চ সীমান্তের কাছে বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটী বাড়ী,

সবসুদ্ধ জনাপনেরো কুড়ির থাকবার ব্যবস্থা। আমরা নানা দেশের লোক সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে এক মার্কিন মহিলা তাঁর ছোট ছেলেটীকে নিয়ে বাস করছিলেন। মহিলাটীর স্বামী মানোয়ারী জাহাজে কাজ করতেন। জাহাজ ভূমধ্যসাগরে কোন বিশেষ কাজে মোতায়েন ছিল। সাহেব সুবিধা পেলেই এসে দুই একদিন জেনিভায় কাটিয়ে যেতেন। আমার ভাব হল প্রথম তাঁর বাচ্চা টেডীর সঙ্গে। সে বাগানের বেঞ্চে আমার পাশে ব'সে রোজ গল্প শুনত। মেম সাহেব দূরে দূরে থাকতেন। একদিন সোজা আমাদের কাছে চ'লে এসে সলজ্জভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "আমিও বসতে পারি কি? তারপর একদিন জরীর উর্দ্দী পরা বাপ এলেন। তিনি সটান আমার কাছে এসে, এক গাল হেসে, আমার হাতে মোচড় দিয়ে নাকি-সুরে বললেন, "আপনি টেডীর বন্ধু! আমিও দু'দিন ব'সে আপনার দেশের রূপকথা শুনব। May I?" মজার কথা নয়! ছ'ফুট লম্বা, বিশাল-ছাতী লালমুখো এই খোকাটী ব'সে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনবে! হাসি চেপে উত্তর দিলাম, "তা বেশ ত! আমার পুঁজী এখনও ফুরোয় নেই।" টেডীর মহা আনন্দ। বললে, "হাঁা বাবা, খুব ভাল গল্প!" এই ভাবে এঁদের সঙ্গে ব'নে গেল। একদিন হল কি, খেয়ে-দেয়ে দুতিনজন ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে দালানে ব'সে রাজনীতিক তর্ক-বিতর্ক করছি, খুব জোর গলায় ভারতের দুর্দ্দশার বর্ণনা করছি,(সেই বছর পুণাতে বিনা-বিচারে জেলে দেওয়ার সূত্রপাত হয়েছে) এমন সময় মার্কিন মহিলাটী এসে আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে যেতেই বললেন, "আমার ঘরের বাহিরে যে balcony বারান্দা আছে, একবার আসবেন সেইখানে!" আমি ত তখন ছেলেমানুষ, অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তবু মনে হল যে মানোয়ারী সাহেবের আপত্তি থাকতে পারে আমার এই রকম যাওয়া আসাতে। জিজ্ঞাসা করলাম, "লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব এসেছেন নাকি! তাঁকে ত খানার সময় দেখলাম না।" Mrs C. হয়ত আমার এসিয়াটীক মনোভাব বুঝলেন। কেন না হেসে উত্তর দিলেন, "না, সে আসে নেই। কিন্তু আমার দেশের কয়েকজন বন্ধু এসেছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" গেলাম মেম-সাহেবের বারান্দায়। দেখি, জনা তিন চার সাহেব-মেম ব'সে রয়েছেন। তাঁরা উঠে আমাকে খুব

আদর-অভ্যর্থনা করলেন। এক বৃদ্ধা বললেন, "আপনার নাম ত দত্ত? আপনি নিশ্চয় স্বামীজীর আত্মীয়। আমরা সবাই তাঁর ভক্ত। আপনার কাছে হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনব।" শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কি ভয়ানক! আমি ত Mrs C.-র কাছে এক দিনও বেদান্ত দর্শনের নাম করি নেই। তাঁর ছেলেকে রূপকথা বলি, এই অপরাধ। ভদ্রমহিলাকে ভাল মানুষ ব'লে জানতাম। তিনি আমার সঙ্গে এই দুশমনী করলেন! তাড়াতাড়ি বললাম, "আজ্ঞে না, আমি স্বামীজীর আত্মীয় নই, তাঁকে কখন চক্ষে দেখি নেই। আমি আইন পড়ছি, ধর্ম্মের কিছুই জানি না।" আমার কথা কেউ কানেও তুললেন না। বৃদ্ধা বললেন, "আপনি হিন্দু ত! প্রত্যেক হিন্দুরই বেডাণ্টে জন্মগত অধিকার। আপনি যা জানেন তাই বলুন। তাতেই আমাদের লাভ।" গোরিং গাঁয়ের চাষাদের কাছে হিন্দুধর্ম্ম কি তা বোঝাতাম বটে। পারিসে ম্যুতেল পরিবারের কাছেও সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভাব নিয়ে বড়াই করেছি। কিন্তু এই বিবেকানন্দ ভক্তদের কি বলব! যাই হোক বাঙ্গালীর ছেলে কথায় হার মানবো! স্বামীজীর জাতভাইও ত বটে! জুড়ে দিলাম যম-নচিকেতার গল্প। সেটা জানা ছিল। মার্কিনরা, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধাটী "বি-ই-উ-টী-ফুল" ইত্যাদি ব'লে আমাকে উৎসাহিত করলেন। সেদিনকার মত রেহাই পেলাম। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কেতাবগুলো হাতড়ে হাতড়ে রমেশ বাবুর "Ancient India" টেনে বের করলাম। রাত দুটো পর্য্যন্ত সেটা প'ড়ে অনেক কিছু বাগালাম। সেই বিদ্যার জোরে দুটো দিন চালালাম ধর্ম্মব্যাখ্যা। তেসরা দিনে মার্কিন দল চ'লে গেলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এদের দলে একটী বছর পনেরো ষোলোর ছোকরা ছিল। দিব্যি দুর্ব্বৃত্ত চালাক ছেলে। যাবার আগে সে আমাকে ব'লে গেল, You are a cute fella. How nicely you hoaxed the old birds! তুমি খুব ঘুঘু ছেলে, কি বোকা বানিয়েছ ঐ বুড়ো-বুড়ীদের!"

পারিসের কথা বলি, আমি বুর্ব্বঁ রাজাদের ভক্ত ছিলাম না। ফরাসীরা তাদের মাথা কেটেছিল, বেশ করেছিল, এই আমার মনোভাব ছিল। তবু, ভেরসাইয়ের রাজবাড়ীতে চতুর্দ্দশ লুই কি মারী আন্তোয়ানেতের যে সব চিহ্ন ছিল তা দেখে মনে বড় কষ্ট হত। কষ্ট হত, তবু বার বার দেখতে যেতাম।

তাদের বাসের ঘর, ঘরসজ্জা, মায় বিছানা পর্য্যন্ত সাজানো ছিল। এই রাজ-বাড়ী কত পুরানো স্মৃতিতে ভরা। লুইয়ের লাভালিয়ের ও মন্তেস্পাঁর সঙ্গে যৌবনে প্রেমলীলা—তাঁর বুড়ো-বয়সে বুড়ী মেন্তেনঁর হুকুম-বরদারী—পরের যুগে পম্পাদুর ও দ্যুবারী কর্ত্তৃক শনৈঃ শনৈঃ ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ সাধন—ত্রিয়ানঁতে নবীন সুন্দরী আন্তোয়ানেতের লীলাখেলা—তারপর সর্ব্বশেষ দৃশ্য, ক্ষুধার্ত্ত পারিসিয়ান canaille-এর (জনতার) অভিযান—এ সবই ত ঘটেছিল এই ভেরসাইতে। জরী-জড়োয়া-পরা রাজা রাণীর ভিড়ের মাঝখান থেকে এক একবার উঁকী মারত একটী কালো বেঁটে পাগড়ীবাঁধা মূর্ত্তি—দ্যুবারীর পোষা বাঁদর জামর—Zamor। বাঙ্গালীর ছেলে সে, ফিরিঙ্গী ডাকাতে তাকে ধ'রে নিয়ে গেছল ছেলেবেলায় কোন্ নদীতীরে ছোট্ট গ্রাম থেকে। পাগড়ী বেঁধে ভাঁড়ামী করত, রাজা রাণীর মন যোগাত। কিন্তু তার অন্তরের আগুন কোনদিন নেবে নেই। ১৭৯০ সালের ভীষণ তাণ্ডবে ফরাসীর সঙ্গে নেচেছিল এই অনামা বাঙ্গালী ক্রীতদাস :

লুভরে কি কি দেখেছিলাম এখন ভুলে গেছি। দুটো জিনিস শুধু মনে আছে। এক, Venus de Milo র মূর্ত্তি। দ্বিতীয়, সেকন্দর ও পুরুরাজের ছবি। Venus-এর মূর্ত্তিটি জগদ্বিখ্যাত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফরাসীরা একে রেখে দিয়েছে আদর করে এক আলাদা ঘরে, চারিদিকে লাল মখমলের পরদা ঝুলছে। সুন্দরের উপযুক্ত সমাদর! কিন্তু আমার এইটুকু দোষ চোখে পড়েছিল, যে এ মানবীর মূর্ত্তি, দেবত্বের চিহ্ন মাত্র নেই।

পুরুরাজের ছবি আমাকে মোহিত করেছিল। আজও মনে আঁকা রয়েছে। জগজ্জয়ী সেকেন্দর বসে রয়েছেন ঘোড়ার উপর, সম্মুখে বিজিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু নৃপতি, তাকে ধরে রয়েছে গ্রীক সেনানীরা। কি আশ্চর্য্য চোখ এই পুরুরাজের! কি কথা কইছে ঐ চোখ! "আমার শরীর শেকলে বেঁধেছ সম্রাট্! কিন্তু মনকে বাঁধতে পারবে না তুমি!" মনকেও কিন্তু বাঁধলেন সেকেন্দর! যে সুতো দিয়ে বেঁধেছিলেন, সে সুতো ত আজও পাওয়া যায়!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

হোয়াইট্‌হেডের দর্শন *

প্রোফেসার হোয়াইটহেডের নাম দার্শনিক-সমাজে সুপরিচিত। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় সমান পারদর্শী বর্ত্তমান সময়ে অন্য কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। বৈজ্ঞানিক হইয়াও দর্শন-সম্বন্ধে সুগভীর কথা যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হোয়াইটহেডের দর্শন-বিষয়ক লেখা প্রায়ই সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সেইজন্য তাঁহাকে যতদূর প্রশংসা করা হয়, তাঁহার তত্ত্বের সহিত সাধারণের ততদূর পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না।

Adventures of Ideas নামে একখানি পুস্তক তিনি কিছু দিন হইল প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অনেক যায়গা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু দার্শনিকভাগ তাঁহার অন্যান্য দার্শনিক লেখার মতই দুর্ব্বোধ্য। পুস্তকখানি চারিভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধে (sociological), দ্বিতীয় ভাগে বহির্জগত-সম্বন্ধে (cosmological), তৃতীয়ভাগে দর্শন-সম্বন্ধে (philosophical) এবং চতুর্থভাগে সভ্যতা-সম্বন্ধে (civilisation) আলোচনা রহিয়াছে।

প্রথম ভাগ

প্রাচীন (পাশ্চাত্য) সভ্যতায় দুইটী জিনিষ বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ছিল দাসত্ব ; প্রায় হাজার বছর ধরিয়া যাহার ঘরে দাসদাসী ছিল তাহাকেই ভদ্র বলা হইত। দ্বিতীয়টী নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার। নৈতিক তত্ত্বের জোরেই সমাজের দোষগুণ বিচার করিতে পারা যায়। প্লেটো কিংবা ষ্টোইক নীতিবিদেরা দাসত্বপ্রথার কোন আলোচনা অথবা দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এমন চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন যাহাতে দাসত্বপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়া ছিল। বিশেষভাবে প্লেটোই মানবাত্মার বৌদ্ধিক ও নৈতিক মহত্ত্বের

* Adventures of Ideas. By A. N. Whitehead [Cambridge University Press. 12s. 6d. net.]

ধারণা আনিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে এই ধারণা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তারপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। মানবাত্মার গৌরবসম্বন্ধে প্লেটোর প্রচারিত তত্ত্ব খৃষ্টী ধর্ম্মের খুবই অনুকূল। খৃষ্টানগণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাতে এমন প্রাণসঞ্চার করিয়া দিলেন যে তাহার জোরে বহু বৎসর পরে দাসত্ব-প্র সমাজে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

দার্শনিক শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের জোরে এইটুকু সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর হইল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানবাত্মার মহত্ত্ব এবং মানবজাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সব কথা বলা হয়, তাহা কতদূর সত্য। মানুষ মানুষ বলিয়াই কি মহান? সব মানুষই কি এক ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ? তাই যদি সত্য হয়, তবে ডারুইন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার করিলেন, তাহার অর্থ ও মূল্য কি? সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে শুধু যোগ্যতমেরাই টিঁকিয়া থাকিতে পারে এবং অযোগ্যেরা পরাজিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত, প্রকৃতি এক স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদিগকে বাছিয়া লন। এই যে স্বাভাবিক চয়নের (natural selection) বৈজ্ঞানিক নিয়ম, ইহার কাছেও মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের কথা নিতান্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে হোয়াইটহেড প্রথমতঃ বলেন, বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা নিয়াই বাদ বিবাদ চলিতেছে, এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমাদের ধার্ম্মিক ও সামাজিক ধারণাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়না। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক নিয়মের এই অর্থ নয় যে পদার্থরাশি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। নিয়মই জোর করিয়া, বস্তুসকল কি রকম চলিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেয়না। কিন্তু বস্তুর মোটামুটি চালচলনের ধরণেরই নামই নিয়ম। বস্তুর গতিবিধি কিছুতেই বদলায় না, এমন নয়; মানুষের ক্রিয়াকলাপের উপর তাহার ধার্ম্মিক আদর্শের প্রভাব পড়িয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে এই আদর্শের মিল বা সামঞ্জস্য না থাকিলেও আমাদের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ এই আদর্শ অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারার নামই সামাজিক বা ধার্ম্মিক উন্নতি সম্পাদন করা। সুতরাং

বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের ধার্ম্মিক বা সামাজিক আদর্শের কোন মূল্য নাই—একথা বলিতে পারা যায় না; কেননা নিয়ম বলিয়া আগে থেকে গড়া কোন রকমের এক কঠিন ছাঁচ পড়িয়া নাই, যাহার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের খাপ না খাওয়ালেই চলিবে না। কিন্তু আমাদের সাধারণ ব্যবহার যেমন হইবে, নিয়মও তেমনি তৈরী হইবে। আমাদের আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার বদলাইলে নিয়মও বদলাইবে। কোন ভৌতিক নিয়মের বাঁধনে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে রুদ্ধ হইয়া নাই।

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দুইটী বিষয়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতা (individual absoluteness) এবং ব্যক্তিগত সাপেক্ষতা (individual relativity); দুইই সভ্যতার অঙ্গ। কখন কখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে বেশী মূল্য দেওয়া হইয়াছে, কখন কখন সমাজের কল্যাণের, সমষ্টিগত জীবনের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুইটী পরস্পর বিরোধী নয়। স্বাধীনতার মূল্য কিসে? কোন ব্যক্তিকে আর দশজনের মত না চলিয়া তাহার ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে কেন? শুধু গতানুগতিক ভাবে চলিলে পুরাতন বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। নূতন কিছুর সৃষ্টি হইতে পারে না। নূতন মূল্যবান কিছুর যাহাতে সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার জন্যই সকলকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন দৃষ্টিতে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে এবং সামাজিক কল্যাণ-সাধনেও আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চরিতার্থ হইতে পারে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানুষের জীবন বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কোন অবস্থায়ই কোন ব্যক্তি একেবারে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না; কিন্তু সভ্যতার ব্যাপারে মানুষকে, রাজকীয় নিয়মের ততটা নয় যতটা নিজ নিজ বিভাগীয় সংঘ-মতের শাসনে থাকিতে হয়। উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকেই তাহাদের নিজ নিজ বিভাগীয় সংঘ-মতের অধীনে থাকিতে হয়। কিন্তু এই শাসনে কখনই ব্যক্তিকে ব্যক্তি-হিসাবে পরাধীন থাকিতে হয় না। তাহার বিদ্যা ও দক্ষতার বিচার হয় মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে নানা অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারের দাবী

আজকাল আর কেহ মানিবেনা। কিন্তু এখানেও হয়ত স্বাধীনতার পো
দ্বারাই আমাদের সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। কোন উদ্দেশ্য সি
করিতে পারাতেই স্বাধীনতার সার্থকতা। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হই
এবং সকলেই ভাল ভাবে থাকিতে চায়। সুতরাং প্রথমতঃ সকলের মঙ্গলজন
কতকগুলি সর্ব্বসাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই লোকে স্বাধীনতা চাহিয়া থাকে
আধুনিক রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা বলিতে তাহাকেই বোঝা উচিত যাহার দ্
সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের বিভিন্ন দান সমাজের সাধারণ কল্যাণের অনুকূ
হইতে পারে। সামাজিক কল্যাণের সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার সামঞ্জ
রাখিতে পারিলে ব্যক্তির কার্য্যকারিতাও বর্দ্ধিত হয়, স্বাধীনতাও সার্থক হয়

সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য রকমের স্বাধীনতাও আছে। যে স্বাধীন
প্লেটো খুঁজিতেছিলেন এবং যাহাকে মুক্তি নামে অভিহিত করিতে পারা যা
আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। এ স্বাধীনতা জ্ঞানদ্বারাই অর্জ্জন করিতে
হয়; যে বাধা ও বিরোধহীন তত্ত্ব, যে সুর বা রাগ বা আনন্দ, (harmony
বিশ্বের মূলে রহিয়াছে, তার উপলব্ধি হইলে এবং আমাদের আত্মাকে তদনুযা
করিতে পারিলেই এ মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

সভ্যজগতে আমাদের সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরের সহিত মি
রাখিবার দরকার হয়। অনেক সময় মানুষ স্বভাবের জোরে আপন
হইতেই অপরের সহিত মিল রাখিয়া চলে। অনেক সময় সমাজে
অন্যান্য লোকের চাপে তাহাকে সকলের সঙ্গে মিল রাখিতে হ
এবং অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া সাধারণ পথে আনিতে হয়
জোর না করিয়া শুধু বুঝাইয়া (by persuation) মানুষকে বিশিষ্ট কোন
পথে যত বেশী আনিতে পারা যাইবে, ততই সভ্যতার বেশী উন্নতি হইয়াছে
বুঝিতে হইবে। জ্ঞানবিস্তার, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্য মানবের কার্য্য
কলাপ শুধু জোরের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। লোককে বুঝাইয়া আপন
মতে আনিতে হয় এবং নিজের জিনিষ কিনাইতে পারা যায়। কখন কখন
বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যেখানে যেখানে বলপ্রয়োগ অপরি
হার্য হয়, সেখানেই সভ্যতা নিজের কাজ করিতে পারিল না, এবং আমাদে
অসভ্যতা প্রকাশ পাইল বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মজগতে যাহা কিছু মূল্যবান তাহাই ইউরোপ মিশর, পালেষ্টাইন ও গ্রীস এই তিনটী প্রাচীন দেশ হইতে পাইয়াছে। মিশর থেকে যন্ত্রকলাসম্বন্ধীয় (technological) ধারণাগুলি আসিয়াছে, পালেষ্টাইন বিশ্বসম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কল্পনা (religious cosmology) দিয়াছে, এবং গ্রীস হইতে সেই সব সুনির্দ্দিষ্ট সাধারণ ধারণাগুলি (generalisations) আসিয়াছে, যাহার জোরে দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে।

নিয়মের (law) কল্পনা জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলেই রহিয়াছে। হোয়াইটহেড নিয়ম সম্বন্ধে চারিটী বিভিন্ন কল্পনার আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম কল্পনাতে নিয়ম বস্তুর অন্তর্নিহিত (immanent) বলিয়া ধরা হয়। যে সব প্রাকৃতিক বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, নিয়ম তাহাদের সত্তারই অঙ্গ। বস্তুর সত্তার মধ্যে যে ঐক্য আছে, সে ঐক্যই তাহাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাহাকেই নিয়ম বলি। নিয়ম বস্তুর সত্তাকেই প্রকাশ করে, বস্তুতে যাহা নিরীক্ষণ করিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিমাত্রকে এখানে নিয়ম বলা হইতেছে না, নিয়মের এই কল্পনাতে বস্তুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মও পরিবর্ত্তিত হয় বুঝিতে হইবে। সুতরাং শাশ্বত কোন নিয়মের বাঁধনে জগতের ক্রমোন্নতি চলিয়াছে একথা বলিতে পারা যাইবে না। এই মতে কোন বস্তুরই নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন সত্তা থাকিতে পারে না। পরস্পরের সহিত ব্যবহারেই তাহাদের সত্তা প্রকাশ পায়। আমাদের কাছে যেগুলি বস্তুর গুণধর্ম্ম বলিয়া লাগে, সেগুলি পরস্পরের সহিত বস্তুর কি রকম সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রকাশ করে মাত্র। ইহাতে বাহ্য (external) সম্বন্ধ না মানিয়া আভ্যন্তরিক (internal) সম্বন্ধই মানিতে হয়।

ইহারই ঠিক বিপরীত মত নিয়মের দ্বিতীয় কল্পনাতে পাওয়া যায়। সেমতে সম্বন্ধকে বাহ্য বলিয়াই মানা হয়। সম্বন্ধ হইলে বা অসম্বন্ধ থাকিলে বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারা যায়। নিয়ম বাহিরের থেকে বস্তুর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে (imposed) মাত্র। (একাজ ভগবানই করিয়াছেন)।

তৃতীয় মতে নিয়ম শুধু সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (description) মাত্র। পর পর যে সব বস্তু দেখিয়া গেলাম, তাহাতে প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান কোন রকমের একাকার গঠন দেখিতে পাইলাম এবং তাহাকেই নিয়ম বলিতেছি তাহা নহে। নিয়ম বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুর ভিতরেও নাই, বাহির হইতেও চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিই নিয়ম।

অতি আধুনিককালে নিয়মকে, শুধু বিবৃতি নয়, ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা (conventional interpretation) বলিয়া ধরা হয়। ইহাই নিয়মের চতুর্থ কল্পনা। অনেক সময় আমরা জাগতিক কোন ঘটনাবলীর কথা না ভাবিয়াই বুদ্ধিবৃত্তির চালনা দ্বারা (যথা গণিত শাস্ত্রে) নানা রকমের কল্পনার কাঠামো (ideal constructions) রচনা করিয়া থাকি। পরে দেখা যায় যে, ঐ গুলির দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে বুঝাইতে বা ব্যক্ত করিতে পারা যায়। প্রাকৃতিক তথ্য প্রকাশ করিবার যে বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে, তাহা নহে। একই কথা যেমন খুসী না হইলেও, নানাভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এখন যদি বিশেষ কোন ভাবে (কোন নিয়মের দ্বারা) তাহা ব্যক্ত করা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সাময়িক চাল (convention) অনুসারে আমাদের মনোযোগ ঐ বিশিষ্ট প্রকারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মূলে আর কোন বস্তুগত অর্থ নিহিত নাই।

হোয়াইটহেড দেখাইয়াছেন, নিয়মের কল্পনার সঙ্গে বিশ্ব সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা বদলাইয়াছে।

আজকালকার গণিতসম্মত পদার্থ বিজ্ঞান (mathematical physics) প্লেটোর মতের খুব অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বস্তু-বিষয়ে আমাদের যে কল্পনা হইয়াছে, তাহার আভাস প্লেটোতেও পাওয়া যায়। বিশ্বের সব পদার্থই যে পরস্পর-সাপেক্ষ, একে অন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে কথা প্লেটোর সর্ব্বাধারের (Receptacle) কল্পনাতেও পাওয়া যায়। দার্শনিক বিচার ব্যতীত এই সমস্তের স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যাহাকে নিতান্ত নিশ্চিত

বলিয়া লাগে, সূক্ষ্ম বিচারে তাহাকে নানা অনিশ্চিততা ও অস্পষ্টতার আবরণে প্রচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। কোন বিষয়ের চরমকথা যে বিজ্ঞানের হাতে নাই, সে কথা বুঝাইয়া দেওয়াও দর্শনের একটা কাজ।

ধর্ম্মেরও একটা দার্শনিক দিক আছে। জগতের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ, মানবাত্মার বহুত্বের সঙ্গে বিশ্বের ঐক্যের কি করিয়া সামঞ্জস্য হয়, এই সব কথার বিচারে দর্শনের আলোচনা করা দরকার। এই সব কথার সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে হইলে, দেখাইতে হইবে যে জগতের জন্য ভগবানের, এবং ভগবানের জন্য জগতের দরকার আছে। প্লেটো যেমন বুঝিয়াছিলেন, আমাদেরও বুঝিতে হইবে, যে সংসার চালনায় ভগবানের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আদর্শের মহিমাতেই পাওয়া যায়, ভৌতিক শক্তিতে নয়। ভগবানের মধ্যে যে সব আদর্শ (ideal) বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলিই, জোর করিয়া নয়, কিন্তু নিজের মহিমায়, যেন বুঝাইয়াই (persuasion), সৃষ্টিকে নূতনভাবে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় ভাগ

পুস্তকের তৃতীয় ভাগে হোয়াইটহেড তাঁহার দর্শনের কথা বলিয়াছেন। এই কথাগুলি বুঝিতে হইলে তাঁহার দর্শনের গোড়ার মোটামুটি কয়েকটা কথা জানা আবশ্যক। সবচেয়ে মুখ্য কথা হইয়াছে এই যে, যাহা কিছু আছে তাহাই গতিশীল। সবই চলন্ত। কিছুই দাঁড়াইয়া নাই। এই অবিরত সার্ব্বভৌম চলা বা নিখিল ক্রিয়াই হোয়াইট্‌হেডীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। ব্যর্গসোঁর দর্শনেও এই চলন্ত ক্রিয়ার কথা মুখ্যভাবে আছে; কিন্তু সে ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় না এবং তাহাতে যেন কিছুই গঠিত হইয়া উঠে না। হোয়াইটহেডের সে রকম মত নয়। হোয়াইটহেড যে নিখিল ক্রিয়াকে বিশ্বের মূলতত্ত্ব বলিয়া মানেন, তাহাতে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিতেছে এবং আবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। যাহা কিছু বাস্তবিক আছে তাহাকে সক্রিয় বর্ত্তমান বস্তু (actual entity) বলা যাক। এই অবিচ্ছেদ্য ক্রিয়ার দুইটা দিক আছে। প্রথমতঃ ক্রিয়াতে একটা বস্তু গঠিত হইয়া উঠিতেছে এবং আপন পূর্ণতার দিকে যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই বর্ত্তমান বস্তুটী আপন

পূর্ণতালাভ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ক্রিয়াতে যেন দুইটা টান রহিয়াছে, একটানে বস্তু "আছে"-র দিকে আসে এবং অন্য টানে "নাই"-র দিকে যায়। কিন্তু ধ্বংস হইয়া কোন বস্তু একেবারে "নাই" হইয়া যায় না, অন্য কোন বর্ত্তমান বস্তু গঠনের উপাদান হইয়া উঠে মাত্র। একেবারে "নাই" হইতে যেমন কখন কিছু আসে না, তেমনি কিছুই একেবারে "নাই" হইয়া যায় না। বর্ত্তমান বস্তু যখন অতীত হইয়া যায়, তখন তার স্বকীয় সত্তা নষ্ট হইল বলিয়া এক অর্থে সে মরিয়া গেল বলিতে পারা যায় কিন্তু আরেক অর্থে সে মরিয়া অমরত্ব লাভ করিল ইহাও বলিতে হইবে। কেন না সে একেবারে নাই হইয়া গেল না, উপাদানরূপে অন্যবস্তুর অঙ্গীভূত হইয়া রহিল। এই রকম গড়াভাঙার কাজ অফুরন্ত ভাবে চলিয়াছে।

এক বর্ত্তমান বস্তু অন্য এক বর্ত্তমান বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং যখন এক বর্ত্তমান বস্তু ধ্বংস হইয়া গেল তখন ঠিক তেমনভাবে সে আর কখনও আসিবে না। কিন্তু আমরা আর এক রকম পদার্থ দেখিতে পাই, সেগুলি সব সময়ই এক রকম থাকে। হিমালয় পর্ব্বত ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সামান্য মাটীর গোলকের গোলাকৃতি সব সময়ই এক থাকিবে। এই বস্তুটা ভাঙিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই একই গোলাকৃতি অন্য বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গোলাকার সব বস্তু নষ্ট হইয়া গেলেও, যখনই কোন গোল বস্তুর সৃষ্টি হইবে, তখনই সেই একই গোলাকৃতি আবার দেখা দিবে। এই রকম শাদা, কাল, গোল, লম্বা প্রভৃতি একার্থক পদার্থকে নিত্য বিষয় (eternal objects) বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বস্তুর যেমন নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল রহিয়াছে, নিত্য বিষয়ের তেমন কিছু নাই। বর্ত্তমান বস্তু নিত্য বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়াই নির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

একবস্তু অন্য বস্তুর সহিত অসম্বদ্ধ হইয়া নাই। কিন্তু সম্বন্ধ কি করিয়া হয়? যখনই আমি কোন বস্তু অনুভব করি, তখনই সেই বস্তু আমার সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। কিছুতেই যদি কোন বস্তুর অনুভূতি আমাতে না হয়, তবে সে বস্তু আমার সঙ্গে সম্বদ্ধ বলিয়া বলা যাইতে পারে না। এই অনুভূতির (feeling) দ্বারাই এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ ও সংসৃষ্ট হয় বুঝিতে হইবে। অনুভূতি বলিতে জ্ঞান বুঝিতে হইবেনা। আমাদের অনুভূতিতে

অনেক সময় জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু সব সময় থাকে না এবং উদ্ভিদাদির কিম্বা অণু পরমাণুর কখনই জ্ঞান আছে বলিয়া বলা যায় না। কিন্তু অনুভব সকলেরই রহিয়াছে। বাস্তবিক অনুভূতি ব্যতিরেকে কোন সত্তার কল্পনাই করা যায় না। যে কোন বস্তুর কথা ভাবিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার উপর অন্য কোন না কোন বস্তুর ক্রিয়া সর্ব্বদাই হইতেছে। ইহাই তাহার অনুভব। এক কথায় অনুভূতিই বর্ত্তমানত্বের অর্থ বলিলেও চলে।

যখন কোন বস্তু বর্ত্তমান অবস্থায় থাকে, তখন সে তার পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বস্তুকে অনুভব করে। কিন্তু যখন সে অতীত হইয়া যায়, তখন তাহার নিজের অনুভব না থাকিলেও সে তাহার পরবর্ত্তী বর্ত্তমান বস্তুর অনুভবের বিষয় হয়। প্রত্যেক বস্তুতেই অন্য বস্তুর অনুভব রহিয়াছে। কোন বস্তুই ঠিক আপনাতে আবদ্ধ নাই। এক বস্তুর সত্তা অনুভূতির ভিতর দিয়া অন্য বস্তুর সত্তাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। ইহাকেই হোয়াইটহেড আপেক্ষিকতার নিয়ম (law of relativity) বলেন।

এই সব প্রাথমিক কথা মনে রাখিয়া এখন হোয়াইটহেড দর্শন-সম্বন্ধে এই পুস্তকে কি বলিয়াছেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। যাহাকে আমরা 'বর্ত্তমান বস্তু' (actual entity) বলিয়াছি, তাহাকে 'অনুভবক্ষণ' (occasion of experience)ও বলিতে পারা যায়। ক্ষণ বলিতে শুধু কাল মাত্র বুঝিতে হইবে না। দেশ ও কাল সম্বন্ধে আজকাল বিশেষজ্ঞদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহাতে দেশকে কাল হইতে এবং কালকে দেশ হইতে পৃথক করিতে বা পৃথকভাবে বুঝিতে পারা যায় না। দেশ কাল মিলিয়াই এক বাস্তব পদার্থ। যাহা কালগত, তাহা দেশগতও বটে। এক দৃষ্টিতে যাহাকে ক্ষণ বলা হইল, তাহাকেই অন্য দৃষ্টিতে অণু বলাও যাইতে পারে। তবে দেশ কাল হইতে আমরা অনুভবক্ষণ বা বর্ত্তমান বস্তু পাইনা। অনুভবক্ষণই মৌলিক বস্তু; তাহা হইতেই আমরা দেশ কালের কল্পনা রচনা করিয়া থাকি।

এই অনুভবক্ষণ কি দিয়া গঠিত? বিষয় ও বিষয়ী দিয়াই অনুভব গঠিত; কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বুঝিতে হইবে না। কেননা অনুভব জ্ঞানমূলক (cognitive) নহে, ভাবনামূলক (emotional)

মাত্র। অত্যন্ত গোড়ার কথা এক বস্তু অন্য বস্তুকে কি রকম জানিল, তা নহে। এক বস্তুর কাছে অন্য বস্তু কি রকম লাগিল। এক বস্তুর উপ অন্য বস্তু কি রকম ভাবনা বা সংস্কার জন্মাইল, ইহাই প্রধান কথা। এই বি জ্ঞান শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকটী প্রাণীতে মাঝে মাঝে দেখা যায় মাত্র।

অনুভব ক্ষণকেই যখন বিষয়-সম্পর্কে তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়ার সহিত ভাবি থাকি, তখন তাহাকে বিষয়ী-রূপে পাই। এই বিশিষ্ট ক্রিয়া অনুভব ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে-ই বিষয়, যে এ ভাবনা বা অনুভব কো বিষয়ীতে উৎপাদন করে। ফলে এই হইল যে, বিষয় হইতেই বিষয়ীর স্ব হয়। সার্ব্বভৌম চলার অগ্রসর হইবার তাড়নায়, যে এই মুহূর্ত্তে বিষয়ী ছি সে-ই অনুভূতির পূর্ণতা লাভ করিয়া বিষয়রূপে পরিণত হয়, তাহার পরব বিষয়ীকে সৃষ্টি করে এবং তাহার অনুভূতির বিষয় হয়। বিষয়ী জড় লাভ করিয়া বিষয়রূপে পরিণত হয়। বিষয় পুরাতন পদার্থ। নূতন হই যাহা আসে, তাহা বিষয়ী। বিষয়ীতেই সৃষ্টির নবীনতা প্রকাশ পায়।

এক অনুভবেরই সীমাহীন অন্তহীন স্রোত চলিয়াছে বলিয়াও ভাবি পারা যায়; ইহাতে অনুভবক্ষণের ব্যক্তিত্ব বা ঐক্য কি করিয়া আসে ভাবনার বিশেষ ঐক্য হইতেই অনুভবক্ষণের ব্যক্তিত্ব বুঝিতে হয়। অনু ভবের প্রবাহ চলিয়াছে বটে, এবং তাহাতে কোথাও কোন রকমের বিচ্ছিন্নত পাওয়া যায় না, ইহাও সত্য, তবুও ইহার মাঝে আপেক্ষিকভাবে ব্যক্তিগ পূর্ণতা রহিয়াছে; তাহাতেই আমরা অনুভবক্ষণের সৃষ্টি ও ধ্বংস বুঝিতে পারি

হোয়াইটহেড বলেন, আমরা যে প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত এ বলিয়া বুঝি তাহা খুবই ভ্রমাত্মক। শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাহা পাই, তাহা ভূত ভবিষ্যতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু অতীত যে বর্ত্তমা আসিয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষে পাই। ইন্দ্রিয়ের দ্বা তাহা বুঝিবার নয়, সুতরাং আমাদের অতীন্দ্রিয় অথবা নিরিন্দ্রিয় (non sensuous) প্রত্যক্ষ রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই নিরিন্দ্রি প্রত্যক্ষের উদাহরণ স্বরূপ আমাদের নিজের সম্বন্ধে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞান আছে বলিয়াই স্মৃতি ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের জ্ঞান সম্ভবপর হইয়া থাকে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পরস্পরের মাঝে মিশিয়া রহিয়াছে। এক অন্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। প্রত্যেক অনুভবক্ষণই আপনার ব্যক্তিগত পূর্ণতা লাভের পর পরবর্ত্তী অনুভবক্ষণে বিষয়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অতীত ও বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মাঝে কি রকম থাকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ভবিষ্যৎও অতীতের মাঝে কি করিয়া থাকে? অত্যন্ত সুদূর ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া অদূর ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের একেবারে অব্যবহিত ভবিষ্যৎ যে কি, তাহা আমরা এখনই অনুভব করিতে পারি। আর ভবিষ্যৎ যখন অতীত ও বর্ত্তমান হইতে উঠিয়া আসিতেছে, তখন বর্ত্তমানে বা অতীতে যে ভবিষ্যৎ একবারে কিছুই নাই, একথা বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান বা অতীতের মাঝে ভবিষ্যৎ সশরীরে বিদ্যমান না থাকিলেও তাহার পূর্ব্বাভাস (anticipation) নিশ্চয়ই রহিয়াছে। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলা যখন অতীত ও বর্ত্তমানের কাজ, তখন, এক দৃষ্টিতে যেমন কার্য্য কারণের মাঝে আছে বলিতে হয়, তেমনি ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান এবং অতীতের মাঝে রহিয়াছে বলিতে হইবে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সমকালীন (contemporary) 'বর্ত্তমান বস্তু' পরস্পরের মধ্যে কি রকমে রহিয়াছে? ভূত ভবিষ্যতের মাঝে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহারা পরস্পরের মাঝে আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদিগকেই সমকালীন বলা হয়, যাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই। ইহারা পরস্পরের মধ্যে কি করিয়া থাকিবে? হোয়াইট্‌হেড স্বীকার করেন যে সমকালীন বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে পরস্পরের মধ্যে নাই। কিন্তু তাহারাও পরোক্ষভাবে পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে। সমকালীন বস্তুর অতীত এক। এবং বর্ত্তমান যখন অতীতেও থাকে, তখন সমকালীন বস্তুও পরস্পরের অতীতে রহিয়াছে একথা বলিতে পারা যায়। আর অতীত যখন বর্ত্তমানে আছে, তখন সমকালীন বস্তুই অতীতের ভিতর দিয়া পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে একথাও বলিতে পারা যাইবে। এই রকম বিশ্বের যাবতীয় বস্তু একে অন্যের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বের এক মহান্ অখণ্ড শরীরের (organic whole) কথা আমরা ভাবিতে পারি।

তাহারপর হোয়াইটহেড দেখাইয়াছেন, বহু বর্ত্তমান বস্তু বা অনুভব মিলিত হইয়া কি করিয়া নানা 'সংঘ' (nexus) ও 'সমাজের' (socie সৃষ্টি করে। কি করিয়া এক বস্তু অন্য বস্তুতে অন্তর্নিবিষ্ট (imman হইয়া থাকে। তাহা এই মাত্র বলা হইয়াছে। একরাশি (set) বস্তু পরস্পরের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া আ বুঝিতে হইবে। আমাদের অনুভূতিতে সংঘের বিভিন্ন বস্তু এক রকম করে বলিয়াই তাহারা এক সংঘে আছে বলিয়া বলা হয়। শুদ্ধ দৈশি সংঘের (spatial nexus) সব অবয়বই সমকালীন; তাহাদের ম পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। শুদ্ধ কালিক সংঘের (temporal nexus) অবয়বই সমকালীন নয়।

কোন সংঘের প্রত্যেক অবয়বের যদি একটী সাধারণ রূপ থা এবং সেই সাধারণ রূপ যদি ঐ সংঘে জন্মাইতেই ঐ অবয়বের আসিয়া থা তবে ঐ সংঘকে সমাজ বলে। শুধু সমকালীন বস্তু বা ব্যক্তি নিয়া সম গঠিত হয় না। সমাজের পূর্ব্বাপর ব্যবস্থা থাকে। যে সব অনুভব নিয়া আমাদের মানসিক জীবন গঠিত, তাহাও একটী সমাজ বিশেষ। পটাদিও এক একটী বৃহৎ সমাজ। এক সমাজের ভিতর অন্য সম থাকিতে পারে। এই রকম সমাজের ভিতর সমাজ তাহার ভিতরে সমাজ এই রকম অসংখ্য ভাবে রহিয়াছে। এই যে মানব শরীর, ইহা একটী প্রকাণ্ড সমাজ বিশেষ। এই সমাজের অন্তর্গত রক্ত, মাংস, অ সমাজ রহিয়াছে। তার ভিতরে জীবাণুর সমাজ রহিয়াছে। তার ভিত আবার অণু পরমাণুর সমাজ রহিয়াছে। এই গুলি দৈশিক ভাবে বুঝি হইবে না। শরীরটা শুধু দেশ-বিশেষ নয়, ইহা কালেও রহিয়াছে। সুত কালিক ভাবেও এই সমাজ-রাশিকে বুঝিতে হইবে। আপাত দৃষ্টিতে যাহা একটী ক্ষুদ্র জড় বস্তু বলিয়া মনে হয়, তাহাকে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দৃষ্টি এক বিপুল অনুসংঘের পরিমিত সময়ব্যাপী জীবনের ইতিহাস বলিলেও চলে।

ইহার পরে গ্রন্থকার 'আভাস' ও 'সত্তার' (appearance an reality) কথা বলিয়াছেন। আভাসের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান ব ও অনুভূতি সম্বন্ধে আরো দুই একটী কথা এখানে জানা দরকার। প্রত্যে

বস্তুরই দুইটা দিক আছে। একটা ভৌতিক (physical) আরেকটা অভৌতিক (mental)। বস্তুর স্বরূপ তাহার অনুভূতিতেই প্রকাশ পায়। সুতরাং বস্তুর ভৌতিক ও অভৌতিক দিক তাহার ভৌতিক অনুভূতি (physical feeling) ও অভৌতিক অনুভূতিতে (conceptual feeling) প্রকাশ পায়। কোন ব্যক্তি যদি আমাকে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে আমি গণ্ড দেশে শুধু তাহার হস্তেরই স্পর্শ অনুভব করি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও অপমানও বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু ভৌতিক অনুভূতিতে শুধু স্পর্শই আসিতে পারে, ইহার ফলে যে ক্রোধ বা অপমানবোধ জন্মিল, আমার আভৌতিক অনুভূতিই তাহার কারণ। ভৌতিক অনুভূতির ফলে হস্তের উষ্ণতা গণ্ডদেশে সংক্রামিত হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং দেখা গেল ভৌতিক অনুভূতিতে এক বর্ত্তমান বস্তু অপর বর্ত্তমান বস্তুতে অনুভূত হয় এবং যখন কোন বস্তু এই রকমভাবে অনুভূত হয়, তখন একের অনুভূতির পুনরাবৃত্তি অন্য বস্তুতে হইয়া থাকে। উপরের দৃষ্টান্তে ভৌতিক অনুভূতির ফলে হস্তের উষ্ণতা (অনুভূতি) গণ্ডে পুনরাবৃত্ত হইল মাত্র। যে অনুভূতিতে নিত্য বিষয় অনুভূত হয় তাহাকে অভৌতিক অনুভূতি বলে। নিত্য বিষয় কোন বর্ত্তমান বস্তু নয়। আমরা কল্পনাতেও যে সব বিষয় পাই, তাহাকেও নিত্য বিষয় বলিতে হয় কেননা তাহা বর্ত্তমান জগতের কোন বস্তু নয়, অথচ যে কোন সময়ে তাহারা আবির্ভূত হইতে পারে। উপরের দৃষ্টান্তে ক্রোধ বা অপমান-বোধের মূলে অনেকটা অভৌতিক অনুভূতির কাজ রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর যেমন ভৌতিক অনুভূতি আছে, তেমনি অভৌতিক অনুভূতিও আছে। প্রত্যেক অনুভবক্ষণ তার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণের পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে। অনেকটা পুনরাবৃত্তি বটে, তাহাই ভৌতিক অনুভূতির লক্ষণ। কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে আবার একেবারে নূতনও বটে, ইহাই অভৌতিক অনুভূতির লক্ষণ। যে কোন মুহূর্ত্তে বিশ্ব তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তের অনেকটা অনুরূপ। কিন্তু অনেকটা নূতনও বটে। এই নবীনতা অভৌতিক অনুভূতির ফলেই আসিয়া থাকে। প্রত্যেক অণুতে যেন এক প্রকারের কল্পনাশক্তি রহিয়াছে, যাহাতে সে আগেকার অবস্থার শুধু পুনরাবৃত্তি না করিয়া নূতন অবস্থা লাভ করে, নূতন পথে চলিতে পারে। ইহাই তাহার অভৌতিক অনুভূতি। এর

ফলেই পরে জীবন, মন ও জ্ঞানের উদয় হয়। নবীনতা বা স্বাতন্ত্র্যই এসবের প্রাণ।

সমস্ত বর্ত্তমান বস্তুই ভৌতিক অনুভূতিতে আসিতে পারে। সমস্তের মূলেই ভৌতিক অনুভূতি আছে। কিন্তু যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই ভৌতিক অনুভূতিতে অনুভব করিতে পায় যায়। ভৌতিক অনুভূতি অনেকটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের নামান্তর মাত্র। ভৌতিক অনুভূতির সঙ্গে অভৌতিক অনুভূতি মিলাইয়া আমরা অতীতকে বর্ত্তমান বলিয়া দেখিয়া থাকি। ইহাই আভাস। কিঞ্চিৎক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী টেবিল আমরা ভৌতিক অনুভূতিতে পাই এবং তাহাই অভৌতিক অনুভূতির সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান টেবিলের 'আভাস' প্রদান করে। এই আভাসের ফলে বস্তুর সহিত ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে। কেননা যাহা বাস্তবে বহু ও জটিল, তাহা আভাসে এক ও সরল হইয়া আমাদের অনুভবে আসে। আমরা জানি টেবিল একটি প্রকাণ্ড সমাজ-বিশেষ; কিন্তু তাহার বহু অবয়ব ও জটিল গঠন আমাদের আভাসিক জ্ঞানে মোটেই উদয় হয় না। আমরা সোজা এক টেবিল বলিয়াই আভাসে পাই।

এই ভাগের শেষ পরিচ্ছেদে দার্শনিক প্রক্রিয়ার (philosophic method) কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে হোয়াইটহেড আধুনিক দর্শনের দুইটী ভুল দেখাইয়াছেন। প্রথমটী এই যে, আমরা মনে করিয়া থাকি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত দেহ দিয়াই আমরা বিশ্বকে অনুভব করি। দ্বিতীয় ভুল এই যে, আমরা ভাবি, অনুভূতির স্বরূপ শুধু অন্তর্নিরীক্ষণ (introspection) দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি। যে সব অনুভূতি সজ্ঞানে হয়, তাহাই অন্তর্নিরীক্ষণ দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে; তাহা অতি সামান্য মাত্র। আমাদের বোঝা উচিত, আমাদের অনুভূতি অতি নিবিড় ভাবে সমস্ত শরীর হইতে উঠিতেছে। ইহার জন্যই এত সহজে আমরা আমাদের নিজকে শরীরের সঙ্গে একীভূত বলিয়া মনে করি।

চতুর্থ ভাগ

গ্রন্থের শেষভাগে সত্য, সৌন্দর্য্য, শান্তি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

কোন আভাস যখন বাস্তবের অনুযায়ী হয়, তখন তাহাকে সত্য বলা যায়। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে, যদি দুইটী বিষয় এমন হয় যে, তাহারা একটী অন্যটীর অঙ্গীভূত না হইলেও তাহাদের মধ্যে আকারের ঐক্য রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধ আছে, যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া অভিহিত করি। এখানে বলা হইল, যে কোন দুই বিষয়ের মধ্যেই সত্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা বাস্তবের সঙ্গে আভাসের সম্বন্ধ-বিশেষকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকি।

আমরা সাধারণতঃ কোন কথা বা প্রতিজ্ঞা (proposition) অথবা প্রত্যক্ষজ্ঞানের (perception) সম্পর্কে সত্য মিথ্যার কথা ভাবিয়া থাকি। 'প্রতিজ্ঞা' সম্বন্ধে হোয়াইটহেডের মত অন্যান্য তার্কিকদের মত হইতে অনেকটা ভিন্ন। সে সবের আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি এই বলিতে পারা যায় যে হোয়াইটহেডের মতে কোন বর্ত্তমান বস্তুই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য (subject) হয় এবং কোন নিত্য বিষয় প্রতিজ্ঞার 'বিধেয়' (predicate) হইয়া থাকে। যে নিত্য বিষয়টী প্রতিজ্ঞার বিধেয়, তাহার দৃষ্টান্ত (instance) রূপে যদি উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা সত্য হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, হোয়াইটহেডের মতে, আমরা শরীরে যাহা অনুভব করিয়া থাকি, তাহাই সমকালীন বাহ্যদেশে আরোপ করিয়া থাকি। ইহাতেই আভাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাহা আমরা আভাসে পাই, তাহা কি বাহ্যদেশের গঠনে বা উপাদানে কোন রকমে নিহিত আছে? হোয়াইটহেড বলেন, এই রকম আছে বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু আভাসে যাহা আছে, তাহা যদি বাস্তবে না থাকে, তবে আভাস বাস্তবের অনুযায়ী কি করিয়া হয়? এই কথার আলোচনায় সৌন্দর্য্যের কথা উঠে।

যখন প্রত্যেক অবয়ব অবয়বান্তরের উপযোগী (adapted) হইয়া উঠে, তখনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। উপযোগী হওয়ার অর্থই কোন উদ্দেশ্যের

উপযোগী হওয়া। এখানে এক অন্যের উপযোগী হওয়ার অর্থ কি ? এক অনুভূতিতে যদি অপরের অনুভূতি লোপ পাইয়া বা ম্লান হইয়া না যায়, তা হইলেই তাহারা পরস্পরের উপযোগী হইল বুঝিতে হইবে। যখন অবয়ব নিয়া কথা, তখন আমরা গৌণ অর্থে সৌন্দর্য্য পাই। বিভিন্ন অবয়বে বিভিন্ন অনুভূতি হইতে পূর্ণাবয়বীর ও এক অনুভূতি আমাদের হইয়া থাকে পূর্ণাবয়বীর এক অনুভূতি দ্বারা যদি বিভিন্ন অবয়বের বিভিন্ন অনুভূতি স্পষ্ট ও গভীরতর হইয়া উঠে এবং সেই রকম যদি বিভিন্ন অবয়বের বিভিন্ন অনুভূতির দ্বারা পূর্ণাবয়বীর এক অনুভূতি স্পষ্ট ও গভীরতর হইয়া উঠে তা সকলেই মুখ্য অর্থে আমরা, সৌন্দর্য্য পাই। পরস্পরের সহিত মিলন সামঞ্জস্যই (harmony) সৌন্দর্য্যের প্রাণ।

সৌন্দর্য্য সত্য হইতেও ব্যাপক ও গোড়ার কথা। সত্য শুধু বাস্তবের সহিত আভাসের সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত। কিন্তু সৌন্দর্য্য বাস্তবের নানা অংশের পরস্পর সম্বন্ধ, আভাসের নানা অংশের পরস্পর সম্বন্ধ এবং বাস্তবের সহিত আভাসের সম্বন্ধ এই সকলের সঙ্গেই সংসৃষ্ট। সত্যের অন্য প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতির অন্য কোন প্রয়োজন নাই ; ইহা এক প্রকারের পরমার্থ বলিলেও চলে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের জন্য সত্যের আবশ্যক আছে ; এ সত্য ততটা বৌদ্ধিক নয়, যতটা আনুভূতিক। যে সত্যে সৌন্দর্য্য নাই, তাহা অতি তুচ্ছ। যে সৌন্দর্য্যে সত্য নাই, তাহা অত্যন্ত হালকা। তাই আভাসের নিজের সৌন্দর্য্য থাকিলেও, তাহা বাস্তবানুযায়ী না হইলে সেই সৌন্দর্য্যের গভীরতা বা গাম্ভীর্য্য বা বিরাটত্ব (massiveness) থাকে না। (আভাসিক সৌন্দর্য্যের গভীরতা দিয়াই কি আভাসের বাস্তবানু যায়িস্বরূপ সত্যতা বুঝিতে হইবে ?)

হোয়াইটহেডের মতে যে সমাজে সত্য, সৌন্দর্য্য, কলা, উদ্ভাবনী-চেষ্টা (adventure) ও শান্তি, এই পাঁচটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সভ্য বলা যায়। জগতে কিছুই যখন স্থির হইয়া নাই, সমস্ত বস্তুই যখন চলন্ত তখন সভ্যতা কখনই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইবে, অথবা অবনতির দিকে যাইবে।

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাহা কিছু সম্ভবপর, তাহা

ঘটে না। কোন স্থলবিশেষে হাজার বস্তু সম্ভবপর হইলেও এক বস্তুই অন্য সবকে ঘটিতে না দিয়া বাস্তবে ঘটিয়া থাকে। যেখানে যাহা ঘটে, সেখানে অন্য অনেক কিছু হইতে পারিত, এবং তাহাদের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকে। সুতরাং যেখানে কোন রকমের সভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে অন্য অনেক রকমেরও সম্ভাবনা থাকে। যাহা সম্ভবপর, তাহা বাস্তবে পরিণত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। একই রকমের সভ্যতার যদি বারবার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে, তবে তাহা প্রথমে যতই ভাল হউক না কেন, আস্তে আস্তে সব সরসতা হারাইয়া বিরক্তিকর ও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। কোন সভ্যতার সজীবতা রক্ষা করিতে হইলে তার মাঝে উদ্ভাবনী-চেষ্টার বীজ থাকা চাই। নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার, নূতন পথে চলিবার, সামর্থ্য না থাকিলে কোন সভ্যতাকেই বাঁচাইয়া রাখা যায় না। শিল্পকলাও সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এই সব থাকিলেও যদি শান্তি না থাকে, তবে সভ্যতার পূর্ণতা-লাভ হয় না। শান্তির অনুভূতি গভীর তাত্ত্বিক দৃষ্টি (metaphysical insight) হইতে আসে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টি কথায় প্রকাশ করিবার ব্যাবহারিক জ্ঞানের মত নয়। ইহা এক রকমের অসীমের উপলব্ধি, যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত দাবী-দাওয়া চুপ হইয়া যায়, এবং বিশ্বের অন্তরে যে নানা বিরোধের উপরেও সামঞ্জস্য বিরাজমান রহিয়াছে, তারই অনুভূতি আমাদের প্রাণে আসে।

এই গ্রন্থে হোয়াইটহেড নানা গূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সেগুলি শুধু তাঁহার পুস্তক মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। হোয়াইটহেডের বক্তব্য ইংরেজীতেও সহজভাবে ব্যক্ত করা কঠিন। উপরে যাহা লেখা হইল তাহা হইতে কোন রকমের অর্থবোধ হয় কি না এবং তাহাতে হোয়াইটহেডের মতামতের কোন আভাস পাওয়া যায় কি না, সহৃদয় পাঠক প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

শ্রীরাসবিহারী দাস

রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ববিচার

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে যে সত্ব যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ল
ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং কবিই তাঁ
কোনোকোনা প্রবন্ধের মধ্যে (যথা "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে, "আমার
প্রবন্ধে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত "মানুষের ধর্ম্ম" শীর্ষক বক্তৃতাগুলি
তাঁহার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া
সমালোচকেরাও এই তত্ত্বটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; এই আলোচনা
সারমর্ম্ম পরিস্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিকাশ
বিভিন্ন তত্ত্বের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে ও বিস্তারিতভাবে আ
বিচারের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিষয়ে যতবেশী বিভিন্ন দিক
যত গভীরভাবে আলোচনা হইবে ততই আমাদের ধারণা আরো-সুস্পষ্ট হই
অন্যদিকে খণ্ড কবিতা ও খণ্ড রচনাগুলিরও তাৎপর্য্য ও অর্থগ্রহণও আমা
পক্ষে আরো সরল হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্যাপকভাবে
রচনাগুলির ক্রমপরিণতি অনুসারেই আলোচনার পক্ষপাতী, বস্তুতঃ এইর
আলোচনাতেই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল পাওয়া যাইতে পা
কবি তাঁহার একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে এই কথাই লিখিয়াছেন :—

"খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই
সেই তাৎপর্য্যটি কি তাহাও আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জা
আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি ;—তাহাদের প্রত্যে
যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে
অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবা
হইয়া আসিয়াছিল।"

গদ্যপ্রবন্ধগুলি এ বিষয়ে অনেক সাহায্যই করিবে, কিন্তু এ ক
মনে রাখিতে হইবে যে কবিতাতেই কবির জীবনের সত্য অনেক ভা
করিয়া ফুটিয়াছে, সাহিত্যরচনাতেই কবির সর্ব্বাপেক্ষা সত্য পরিচয় পা
যাইবে, অন্যত্র নহে :

"যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজে
অন্তরতম কথা না বলতেও পারি। সেখানে বাইরের শোনা কথা নি

ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লোকের প্রকৃতি নিজের পরিচয় দেয়—সেটা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।" (সবুজপত্র, ১৩২৪, ৩৯৭ পৃঃ)

এখানে আমরা কবির সাহিত্যরচনা এবং সমালোচকগণের ব্যাখা উভয়েরই উপর নির্ভর করিয়া কবির তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমালোচকদের মধ্যে প্রথমেই পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে হয়। বস্তুতঃ কবির রচনাগুলির স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির ধারাকে অবলম্বন করিয়া আলোচনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন বোধহয় তিনিই করেন। ব্যাপকভাবে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটির ব্যাখ্যার সূত্রপাত তিনিই করিয়া গিয়াছেন।

১৩১৮ সালে অজিতবাবুর "রবীন্দ্রনাথ" প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েক বৎসর পরে "কাব্যপরিক্রমা" বাহির হয়। তাহার পর ত কত বৎসরই অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অজিতবাবুর প্রবন্ধগুলিই রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার পক্ষে আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্বল।

সম্প্রতি "কাব্যপরিক্রমার" দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই উপলক্ষে গ্রন্থখানি আবার পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। অজিতবাবুর অন্যান্য রচনাও এই সঙ্গে পড়িয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থে অজিতকুমার নানাস্থলে বারবার করিয়া রবীন্দ্রকাব্যের মূলসুরেরই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ; আমরা প্রথমে এইটিকেই বুঝিতে চেষ্টা করিব। অজিতকুমার লিখিতেছেন :—"বিশ্বকে, মানুষের জীবনকে নানাদিক দিয়া উপলব্ধি করিয়া এই ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।……কবির কাব্যের মধ্যে আমরা তাঁহার সেই বিশ্ব-অভিসার-যাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে পাই।……আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে ইহাই দেখিয়াছি—বিশ্ব-উপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা এবং বারম্বার তাহার বাধা হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস।"

কিন্তু এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূলসুরটির সন্ধান করিতে গিয়া অজিতকুমার কাব্যের অন্যান্য দিকে দৃষ্টি না দিয়া কাব্যের তত্ত্বের দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন, কাব্য-হিসাবে রচনাগুলির বিচার না করিয়া এই তত্ত্ব লইয়াই

ব্যস্ত আছেন। আমাদের দেশের ও পশ্চিমের ধর্ম্ম দর্শন বিজ্ঞান-শিল্পের মতামত ও তত্ত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গভীর চিন্তাশীলতারই পরিচয় পাই। তবে কোনো কোনো এই নিছক তত্ত্বালোচনা, কবিতার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণের কাব্যের রসগ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে নাই। জটিল তত্ত্বের অবতারণা অনেকসময়েই কবিতাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিবার অন্তরায় হইয়াই উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "জীবনদেবতার" আলোচনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে "কাব্য-পরিক্রমা"র "নিবেদনে" অজিতকুমার নিজেই বলিয়াছেন ঃ—"জীবনদেবতার তত্ত্ব সম্যক বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অনেকে উহা অলস কল্পনা মাত্র মনে করেন। এ কালের জীব অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা হইতে মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের মূল ও মানবচৈ সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে, "জীবনদেবতা"র ভাবের সা তাহাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার প্রসঙ্গে সেই সকল তত্ত্বের আলো উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

"জীবনদেবতা" প্রবন্ধের প্রায় গোড়াতেই অজিতকুমার বলিতেছেন ঃ "জীবনদেবতার আইডিয়ার সঙ্গে যদি দর্শনবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সা দেখা যায় তবে ইহাই বলিব, যে এ আইডিয়াটী সত্য, এ নিছক কল্পনা নয় পরে এই বিষয়ে অবতরণ করিয়া সমালোচক ডারউইনের অভিব্যক্তিবা তাঁহার পরবর্ত্তী চেলাদের মতামত, স্যামুয়েল বাট্‌লার, ফেক্‌না ব্যর্গসঁ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের তত্ত্ব লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। অথচ এ যে এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করিয়া জীবনদেব আইডিয়াটির সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই আলো তত্ত্বগুলির মূল্য এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। পরিশিষ্টে অজিতকু নিজেই লিখিয়াছেন, "জীবনদেবতা প্রবন্ধে আমরা জীবতত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত কথা বলিয়াছি তাহা পণ্ডিত-সমাজে এখন অগ্রাহ্য।...শুধু জীবতত্ত্ব ন মনস্তত্ত্বেও ঠিক এই রকম একটা মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।"

বস্তুতঃ কবির জীবনে যে সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণের জ দর্শন বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কবি

আইডিয়া সর্ব্ব কালেই সর্ব্ব অবস্থাতেই সত্য, তাহার প্রমাণপত্র কাব্যের ভিতরেই রহিয়াছে। তাহাকে নিছক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বসম্বন্ধে প্রথম আলোচ্য বিষয় তাঁহার কাব্য এবং তাঁহার জীবন এই উভয়ের যোগাযোগ।

সাধারণভাবে কাব্য ও জীবনের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির এই দুই বিকাশের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমালোচকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

প্রথম যৌবন হইতেই কবি একথা বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহার সাহিত্য-রচনা তাঁহার জীবনেরই বহিস্ফুরণ। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (সন্ধ্যা-সঙ্গীতের যুগে) প্রকাশিত বিবিধপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে মনের গঠনকার্য্য চলিতেছে। এই মহাশিল্পশালা এক নিমেষকালও বন্ধ থাকে না। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানবের অভ্যন্তরে অনবরত কি নির্ম্মাণকার্য্যই চলিতেছে। অবিশ্রাম কত কি আসিতেছে, যাইতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে।" (বিবিধ প্রসঙ্গ, সমাপন, ১৪৩ পৃঃ)

অনেক বৎসর পরে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থেও কবি এইভাবের কথা বলিয়াছেন ঃ—

"জগতের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে অন্তর বারংবার আঘাত করিয়াছে—সেই অনির্ব্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে ;—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে ; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে ; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহা যদি কবির কাব্যে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে ;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।" (বঙ্গভাষার লেখক [১৩১১] ৯৮৩-৯৮৪ পৃঃ)

এ বিষয়ে অজিতকুমার লিখিতেছেন :—

"কবির কাব্য-রচনা ও জীবন-রচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কা আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।"..."রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার স সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, পৃথিবীতে বোধ হয় আ কোন কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে এমন একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চ নাই।"........."কোন কবির কাব্য যে তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করি তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোন অপেক্ষা রাখে নাই এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। (কাব্য-পরিক্রমা, ১৫৭-১৫৮ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনার মধ্যেই তাঁহার জীবনের ছবি কিছু পরিমাণে দেখা দিয়াছে ; পরিণত জীবনের কোন কোন কাব্যে ইহা অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজিতকুমার লিখিয়াছেন ঃ—"গীতাঞ্জলির এই সাধনার কবিতাগুলি——ইহাই আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারী—শুধু প্রভেদ এই যে মানুষ ডায়ারী লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন না হইয়া পারে না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে।" (কাব্য-পরিক্রমা, ১৪০-১৪১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ জীবনরসের রসিক, "জীবন-শিল্পী" ; তাঁহার কাব্যে যেমন তাঁহার জীবনের প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার জীবনও একখানি কাব্য। "রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে এবং অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর জীবন।" (জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন, এই উভয়ের যোগাযোগ, পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রভাব এবং বিকাশের ও পরিণতির আসল প্রকৃতি, এ সকল বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা নিতান্তই প্রয়োজন।

আরেকটি আলোচ্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথের রচনার মূল সুর। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা। এই আলোচনার

মধ্যেই অন্যান্য কথাগুলি আসিয়া পড়িতেছে, নানাদিক দিয়া ইহাকেই স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

অজিতকুমার বলিতেছেন :—

"আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এই সর্ব্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর ; অন্যান্য সমস্ত বৈচিত্র্য—সৌন্দর্য্য, প্রেম, স্বদেশানুরাগ, সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা এই মূল সুরের দ্বারা বৃহৎ বিশ্বব্যাপী একটি প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকল কাব্যের মধ্যেই যেখানেই জীবন কোন প্রবৃত্তির ভিতরে বাঁধা পড়িতেছে, সেইখানেই আপনার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহাকে পাইবার কান্না লাগিয়াই আছে, এই মূল সুরের মধ্যেই সেই ক্রন্দনের অর্থ নিহিত। এই সুরই কবির জীবনের সকল বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া তুলিয়াছে—এই সুরই বারম্বার ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া বিরাটের সঙ্গে তাঁহার জীবনকে যুক্ত করিয়াছে।" (রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২-১৩)

এই "সর্ব্বানুভূতি"র প্রকৃত পরিপূর্ণ অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগের ভাবকে অজিতকুমার একস্থানে সর্ব্বানুভূতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। "সমস্ত জলস্থল আকাশকে সমস্ত মনুষ্য-সমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্ব্বানুভূতি।" অন্যত্র বলিতেছেন ঃ—"এই সাধনার মধ্যে কবি এখনও নিমগ্ন হইয়া আছেন, সকল সত্যকে রসময় করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার সাধনায়, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে মানব ইতিহাসকে একের মধ্যে অখণ্ড করিয়া বোধ করিবার সাধনায়।" এই পরম একের উপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই সর্ব্বানুভূতির মূল কথা এই যে, সকলকে লইয়াই অনন্ত, সীমাকে লইয়াই অসীম, অসীমের মধ্যে যেমন সীমা বিরাজ করিতেছে. তেমনই সীমার মধ্যে অসীম তাঁহার আপন সুর বাজাইতেছেন। "সীমা সীমাবদ্ধ নহে তাহা অতল-স্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে।" (জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ১৭১)

মহর্ষির জীবনেও এই সাধনাই দেখিতে পাই, এই পরম সত্যের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি, শ্রেষ্ঠ বিকাশ. তাঁহার একটি উক্তির মধ্যে দেখিতে পাই ঃ— "সাধকদিগকে এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই

ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।.........আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদে বাহিরে ভাবি, কখনো ভাবি যে তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু এ সময়ে সেই অবাতপ্রাণিত নিত্য জাগ্রত পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম্ম প্রে করিতেছেন, এবং বহির্জ্জগতে জীবের কাম্য বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।...... যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান—দেখিতে পান যে তি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকি সকলের বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্য জানিতেছেন, তিনিই পরম যোগী।——তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
(অজিতকুমারের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,' ১৯০-১৯১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এই তিনেরই উপলব্ধি, তিনি সব কিছুর বাহিরে একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, বিশ্ব প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি অসীমেরই আনন্দের প্রকাশ দেখিতেছেন, আবা মানব-ইতিহাসে এবং নরনারীর হৃদয়ের খেলায় বিরাট পুরুষের চিন্ময়তার ও প্রেমের পরিচয় পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে যে বিশ্বাতীত আছেন সে অনন্তেরও পূজারী। এই কথাটিই ভাল করিয়া বুঝিতে চাই।

প্রথম যৌবনে কবি ব্রহ্মের যে আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা কেবল "বৃহতের আস্বাদনে", "বিরাট অসীমের সহিত একান্ত যোগে"। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির কবি না বলিয়া আকাশের কবি বলিতেই ইচ্ছা হয় জানিনা, শেলী ও হুইট্‌ম্যান্ ব্যতীত আর কোন্ কবি বলিতে পারিতেন :—

> আঁধার কোণে থাকিস্ তোরা,
> জানিস কিরে কত সে সুখ,
> আকাশ পানে চাহিলে পরে
> আকাশ পানে তুলিলে মুখ!
> সুদূর দূ-র, সুনীল নী-ল,
> সুদূরে পাখী উড়িয়া যায়!
> সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
> সুদূর হতে আসিছে বায়।
> ...   .

> চাহিয়া আছে আমার মুখে
> কিরণময় আমারি সুখে
> আকাশ যেন আমারি তরে
> রয়েছে বুক পেতে।
> মনেতে করি আমারি যেন
> আকাশ ভরা প্রাণ।...

(প্রভাত সঙ্গীত, ১৮০৫ শক, ১১৩-১১৪ পৃঃ)

আকাশ তাঁহাকে কী গভীর টানেই টানিয়াছে; "আকাশের পাখী" আকাশে বিচরণ করিয়াই আনন্দ পাইয়াছেন, অসীম-নীলিমা-পিয়াসী কবি অনন্তনীল আকাশেই আত্মার তৃপ্তি পান :

> আকাশের পাখী তুমি ছিলে...

(মানসী—কবির প্রতি নিবেদন)

> আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী

(হৃদয় আকাশ—কড়ি ও কোমল)

> দেখি দেখি আরো দেখি
> অসীম উদার শূন্যে
> আরো দূরে—আরো দূরে যাই—
> দেখি আজ এ অনন্তে
> আপনা হারায়ে ফেলে
> আর যেন খুঁজিয়া না পাই।—
> অসীমে সুনীলে শূন্যে
> বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
> তারে যেন দেখা নাহি যায়—
> নিশীথের মাঝে শুধু
> মহান্ একাকী আমি
> অতলেতে ডুবিয়ে কোথায়
> ...   .
> বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
> মিশায়ে মিলায়ে যাই
> অনন্তের সুদূর সুদূরে।

(পূর্ণিমায়—ছবি ও গান)

বিশাল আকাশে কবি যে আনন্দ পাইয়াছেন, যে স্বাধীনতার বৃহতের আস্বাদন, সেই আনন্দই সকলের হৃদয়ে বিলাইয়া দিতে চান। অনন্তের কূলে কুসুম তুলিয়া ছোট ছোট ফুলে মালা গাঁথিতেছেন, তাঁহা আশা আছে ঃ

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস,
মনে আনে রবিকর নিমেষ স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

(ছোট ফুল—কড়ি ও কোমল)

বৃহৎ আকাশের আনন্দ অমৃত ধারার আস্বাদ পাইয়া কবির অনির্ব্বচনীয় উল্লাস ও আনন্দ তাহা অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র 'খেয়া' হইতে উদ্ধৃত ঃ

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জ্জন গান ?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ ?
গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্যপরে
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গীবিহীন নির্ম্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্দ্ধমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণ সুরে
অর্থবিহীন কলকথায় ?
আপন মনের পাইনে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃত-পান।

(নীড় ও আকাশ)

অসীমের ক্ষুধা বৃহতের পিপাসা অতি প্রবল ভাবেই কিশোর কবির চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল ; বাহিরের সঙ্গে তাঁহার জীবনের একটি অতি সহজ যোগ ছিল ; কিন্তু ইহাকে ঠিক সর্ব্বানুভূতি বলা যায় না ; এ যেন কেবলমাত্র বাহিরের দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখিবার প্রয়াস, সমস্ত চিত্ত, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বিশ্বকে প্রাণে লইবার বাসনা নয় ; এই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসেরই ব্যাপ্তি। কিন্তু কবি এ অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার চিত্ত জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত তাঁহার সহযোগটি হারাইয়া গেল।

আবার প্রভাত-সঙ্গীতে কবি আপনাকে ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহার শিশুকালের বিশ্বকে আবার নূতন করিয়া পাইলেন। সীমার সমস্ত বন্ধন, সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের আনন্দরূপটি হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

"দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত।......শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।......এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।......সেই পৃথিবী-ব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম।" (জীবনস্মৃতি, ১৫৬-৭ পৃঃ)

আকাশের অসীমের ব্যাপ্তি অপেক্ষা সীমার মধ্যেই অসীমের গভীরতাই এখন কবির চিত্তকে আকর্ষণ করিত। "নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। ...এক এক দিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে।" পূর্ব্বে বৃহৎকে অনন্তকে দেখিবার জন্যই ব্যাকুলতা ছিল, এখন সেই বিশ্বের বৃহতের অনন্তের মধ্যে বিধৃত প্রত্যেকটি সীমাবদ্ধ বিশেষকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, সীমার মধ্যেই অসীমের খেলা দেখিতে পাইলেন ; অশেষ যে বিশেষের বাহিরে নহে, তিনি যে বিশেষকে লইয়াই আছেন, তাহার স্পষ্ট আভাস পাইলেন। হৃদয়ের পথ দিয়াই

অসীমের পরিচয় পাইলেন। "একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবী করে ব
কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোন কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণ
দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পা
যায়।...প্রেম একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীম
উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষবিশেষের মধ্য দি
অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে য
পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে—বাহি
সহিত, প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্ব্বা
সত্য হইয়া উঠে।" (জীবনস্মৃতি, ১৬১ পৃঃ)

কবি যখন 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিতেছিলে
তখন "আলোচনা" শীর্ষক ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধে এই নাটিকাখানির ভি
কার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রব
গুলিতে রবীন্দ্রনাথ সীমার অসীমের সহিত মিলনের কথাই লিখিয়াছেন, এ
সেই সময়ে এই তত্ত্বটির প্রকাশ এখানেই পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়াছিল।

"আলোচনা"র কথা এখানে বিস্তৃতভাবে লিখিবার প্রয়োজন নাই
তবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কাব্যগুলির ভিতরকার ভাবের এমন সহজ সুন্দ
তত্ত্বব্যাখ্যা ত বেশী দেখি নাই। যে তত্ত্ব তাঁহার অধিকাংশ রচনার মধ্যে পা
সেই সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সৌন্দর্য্যস্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটা বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে র
তিনি নিঃশ্বাস পূরিতেছেন এবং ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে
মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চা
সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বানগান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী।......সে বাঁশীর স্বর কি
বলিতেছে? জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে, 'রাধে, তুমি আমার,'—
আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদের
নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—'তুমি আমার, তুমি আমার কা
আইস।'......জগতের সৌন্দর্য্য অসীম সৌন্দর্য্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসি
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্য্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁ
পড়িয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচি
শোভায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভা
অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়, ত
তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া মালা-বদল করিয়াছে। তিনি নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ-বন্ধন।"

(রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ, আলোচনা, ১১৭০-১১৭১ পৃঃ)

মিষ্টিসিজমের ভিতরকার কথা এইটিই, লীলাতত্ত্বেরও কথা ইহাই। শ্রীমতী ইভেলিন আন্‌ডারহিল্ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন :—

Mystical thinkers agree in thinking that there is a mutual attraction between the Spark of the soul, the free divine germ in man, and the fount from which it came forth. "We long for the Absolute only in so far as in us the Absolute also longs, and seeks, through our very temporal striving, the peace that is now here in time, but only, and yet absolutely in Eternity". "He it is that desireth in thee and He it is that is desired. He is all and He doth all if thou couldst see Him." The Homeward journey of man's spirit, then, due to the push of a divine life within answering to the pull of a divine life without···Thou needst not call Him from a distance; to wait until thou openest is harder for Him than for thee. He needs thee a thousand times more than thou canst need Him.

(An Introduction to Mysticism, pp. 158-159)

অজিতকুমার "কাব্য-পরিক্রমার"র "গীতিমাল্য" প্রবন্ধটিতে বৈষ্ণব-তত্ত্বের সার কথাটি অতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন :

লীলাতত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানব-জীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থান পতন, সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু—সমস্তই শ্রীভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভগবান অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকল্প হইয়াও প্রেমে অনন্তের মধ্যে ধরা দিয়াছেন; সেইজন্যই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না।... সমস্ত জীবনের এই সুখ-দুঃখ-বিচিত্র পথ তাঁহারি অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন; এই পথেই কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই যে বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ইহাই সার কথা। (কাব্যপরিক্রমা, ১৫০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের ক্রমপরিণতির ধারাটির স্বরূপ কি? কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার জীবনে অনেকগুলি অবস্থা, অনেকগুলি স্তর দেখা গিয়াছে, তিনি ক্রমাগতই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর

হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি বার বার প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করি তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যে, সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। "নদীর বাঁকে মত ক্রমাগত একটা হইতে অন্যটায়, একরস হইতে অন্য রসে তাঁহার স্ব আপনার সার্থকতা খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে এবং অবশেষে ধর্ম্মের মধ্যে আপন সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।" কোনও সমালো নাকি একথাও ভাবিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য একদা নিসর্গ ও নারীর বন্ধ রূপজগতে আবদ্ধ ছিল, তাহারপর একদিন মুক্তিলাভ করিয়া তাহা অরূপে পথে যাত্রা করিল এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া অরূপে প্রেরণায় তাহা নবরূপ পরিগ্রহ করিল।

কেহ কেহ এইভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া কবির কাব্য ও জীবনে আলোচনা করিয়াছেন। তবে কবি স্বয়ং এভাবে আলোচনা করিতে চাহে না। "আমি আত্মাকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠা খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।" (বঙ্গভাষা লেখক, ৯৭৭ পৃঃ) "এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করি পারি।" (৯৮১ পৃঃ)

বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে পাইবার জন্য তিনি চিরকালই ব্যাকুল, এ বৃহৎ বিরাটের ব্যাপ্তিই তাঁহাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল, বাহির, বাহি বলিয়াই, তাঁহার প্রিয় ছিল, দূর, দূর বলিয়াই, তাঁহাকে মুগ্ধ করি পারিয়াছিল। তাঁহার কবি-জীবনের প্রারম্ভে সীমা ও রূপের জগতে তিনি আব ছিলেন একথা বলা যায় না, বরং ইহাই বলিতে হয় যে "প্রভাত সঙ্গীতে কবি অসীম সুদূরের পিয়াসীরূপেই দেখা দিয়াছেন। তাহার পর তাঁহা প্রাণ-নির্ঝরিণী যখন গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন হইতেই তাঁহা পরিপূর্ণ জীবনের প্রথম প্রকাশ। দৃষ্টির এই আকস্মিক আবরণ উন্মোচন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই আনন্দময় উপলব্ধি, এইটি প্রথমে অখণ্ডভাবে দে দিয়া তাহারপরে জীবনের বিচিত্রতায় খণ্ড খণ্ড পথ বাহিয়া আবার ঐ অখ সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিলাভ করিবার দিকে শেষ বয়সে কবিকে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিয়াছে। এক মুহূর্ত্তেই কবি অসীমের একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখি

পাইলেন, কেবল যে অসীমকে দেখিতে পাইলেন তাহা নয়, অসীমের মধ্যে বিধৃত সীমারও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিল; সে সৌন্দর্য্য, সে মাধুর্য্য অসীমেরই; বিশ্বপ্রকৃতিতে সর্ব্বত্র কণায় কণায় যে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া আছে, আবার মানবজগতের অন্তরে অন্তরে সেই মাধুর্য্য, সেই প্রেম, সেই অনির্ব্বচনীয় রসধারা প্রবাহিত হইতেছে।

"দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্য্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সে দিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ীর দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনও তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর।... দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত।...আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।...সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গ লীলার মত বহিয়া চলিয়াছে।...একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।... বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটিকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা যখন পরম পরিণামটিকে যেন অনির্ব্বচনীয় রূপে জানিতে পারি।" (জীবনস্মৃতি)

"সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূতভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।"

(মানুষের ধর্ম্ম, পরিশিষ্ট, ১০৫ পৃঃ)

আমরা যখন বলি যে মানবের আত্মা সীমা হইতে অসীমের দিকে, ক্ষুদ্র হইতে বিরাটের দিকে, অন্ত হইতে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখনও বোধহয় পরিপূর্ণ সত্যটিকে বুঝাইয়া বলিতে পারি না, ত্যাগ করিয়া, অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াটাই শেষ কথা নয়।

বোধহয় একথা বলিলে এ বিষয়টিকে খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে, যে সমস্ত কিছুকে, সমগ্রকে অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়াই জীবনের সার্থকতালাভ করা যায়, ত্যাগের দ্বারা নয়, বাসনা-রাহিত্যের দ্বারাই; বর্জ্জনের দ্বারা নয়, গ্রহণের দ্বারাই বিশ্বকে ভোগ করিতে হইবে। "সংসারকে অতিক্রম করার অর্থ সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে সত্য করিয়া জানা।" সমস্ত

জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা অধিকৃত (inhabited) রূপে (ঈশাবাস্যমিদং সর্ব… দেখিতে হইবে, আবার সমস্ত জগতের অতীত বিরাট পুরুষকেও তাহার বাহি… দেখিতে হইবে। তিনি যেখানে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেখা… তিনি সত্য ; আবার তাহার বাহিরেও তাঁহার সত্তা চিরবিরাজমান। মান… আত্মাকে এই বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধির সাধনা করিতে হইবে, আবার … বিশ্বাতীতেরও জন্য তাহার অসীম ক্ষুধা তাহাকে গভীরের স্পর্শ আনি… দিতেছে।

"Mystic পুরুষ ধ্যানশক্তিতে তার ফলাফলবিহীন সাধনায় বাস্তবের আ… একটার পর একটা যতই মোচন করেছে ততই রসের লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে … পরিচয় পেয়েছে।… পুরুষ Mystic, অতল রসের ডুবারী, ধ্যানী।… পুরুষের … আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তোলে। 'We a… the dreamers of dreams', এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মা… ইতিহাসে নানা কীর্ত্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ পরিগ্রহ করচে। এই ধ্যান সমগ্রকে দে… চায় ব'লেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জ্জন করে।… মোটকথা, বাস্তবের মধ্যে … সব বিশেষের বাহুল্য আছে তা'কে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। … জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা, এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় পুরুষের এ… আগ্রহ। এবং এই জন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এতো বেশী উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরা… এতো বেশী সম্পদ লাভ করেছে।" (যাত্রী)

রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্রের তৃষ্ণা, সমগ্রের দৃষ্টি, এই সমগ্রতার পিপা… তাঁহার আত্মিক ও মানসিক বিকাশের, তাঁহার সাধনার একটি মূল কথা; তি… বাস্তবকে পরিপূর্ণ সত্যের দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছেন, বাস্তবকে গ্রহণ করি… তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থে "প্রণা… কবিতাটিতে তাঁহার সাধনার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন :—

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরা'র গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।…

রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রকে, বিশেষকে ধ্যানের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, সেই… তাহাকে সমগ্রের মধ্যে সত্যভাবেই দেখিতে পাইয়াছেন, এই সাধনই তাঁহা… অবশেষে আবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যেই উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

"সুখ দুঃখ আলোক অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে এবং নানাছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।" (জীবনস্মৃতি)

সৌন্দর্য্য তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিয়াছে, এই সৌন্দর্য্যের সাধনায় তিনি অসীমেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, সেখানেও তিনি অন্তরের আনন্দরসে অরূপ রতনেরই উপলব্ধি করিয়াছেন। রূপ সত্য হইতে পারে, রূপ পূর্ণতার একটি প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু রূপের মধ্যে সমগ্রের পূর্ণ প্রকাশ নাই, সেইজন্যই রূপের অন্তরালে আনন্দরূপমমৃতম্‌কে দেখিতে চাহিয়াছেন। "গীতায় আছে কর্ম্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্চে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্ম্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় "মা গৃধঃ", লোভ কোরো না। সৌন্দর্য্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম্ম" (যাত্রী)। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-ভোগের, সেই সত্যদৃষ্টির, সুন্দরের মধ্যে সেই অনন্তের স্পর্শ লাভেরই ইতিহাস।

তাঁহার মনে যখন প্রেম জাগিয়াছে, সেও তাঁহার অন্তরকেই জাগাইয়াছে, তাঁহাকে ক্ষুদ্রতার বন্ধনে বাঁধিতে পারে নাই।

"পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তা'র প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোন মেয়েকে ভালবাসে তখন তা'কে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ান্ পড়ে দেখো। মেয়েরা একথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ করে সৃষ্টি করতে থাকে। কেননা প্রার্থনার বেগ প্রার্থনার তাপ, মানুষের সংসারে সৃষ্টির একটা প্রধান শক্তি।… পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সেতো ধ্যানের জিনিষও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দু'য়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধুলো এবং নিজের চারদিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে।" (যাত্রী)

প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্যনীয় সত্যের সহিত অন্তরের সুগভীর মিলটিকে উপলব্ধি করিয়াই তিনি আত্মার তৃপ্তি পাইয়াছেন।

কবি প্রথম জীবনে সত্যবোধের যে আভাস পাইয়াছিলেন তাহা র আস্বাদনে। অসীমের অনন্তের সমগ্রতার স্বাভাবিক পিপাসা তাঁহার জী প্রেরণা, সেই পিপাসাই তাঁহাকে জীবনের পথে চালাইতেছে। তিনি শক্তিতে বাস্তবের আবরণ মোচন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, সীমার অসীমের সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে উপলব্ধি করিতেছেন, আবার এইভাবে শূন্যতায় যে বিরাট অনন্ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দিকেই চলিতেছেন। তাঁহার অন্তরের আনন্দ তাঁহাকে বাহিরের দিকেই গিয়াছিল আবার সেই আনন্দই তাঁহাকে অন্তরের অভিমুখেই ফির আনিয়াছে।

বস্তুতঃ এই লীলা তাঁহার জীবনদেবতারই খেলা, তাঁহার দোসরেরই ম তিনিই মানবের আত্মাকে বাঁধন পরাইতেছেন, আবার নিজেই সেই খুলিয়া দিতেছেন; তিনি স্বয়ং এই বাঁধন পরিতেছেন, আবার সেই ব হইতে লীলাভরে অন্তর্হিত হইতেছেন। "বিশ্ব খেলোয়াড়ের" এই খে আমরা সর্ব্বত্র দেখিতেছি, "বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি ব বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না।" (চতুরঙ্গ, ১০০ পৃঃ)

> "হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
> সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
> ছদ্মরণবেশে।" (পূরবী)

এই খেলার সাথী খেলাতেই নিমন্ত্রণ করেন, খেলার গুরু লীলার স হইতেই চাহেন :—

> "জানি জানি তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
> ওগো খেলার সাথী।
> এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
> নয় আরতির বাতি।
> তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
> নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
> তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশীর রবে
> পূর্ণ হবে রাতি।
> তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
> নয় আরতির বাতি।" (খেলা, পূরবী ৮

এই লীলারই আর একটি অঙ্গ জীবাত্মার অনন্তকালে অনন্ত পথে যাত্রা এবং প্রত্যাবর্ত্তন; কবির আত্মা পরমাত্মার সহিত একান্ত নিবিড় মিলন সম্ভোগ করিতেছিল, তথা হইতে বাহির হইয়া অনেক কালের যাত্রা অনেক দূরের পথ অতিক্রম করিয়া আবার সেই অন্তরের ঠাকুরের কাছেই ফিরিয়া আসে। লীলাতত্ত্বের এই দিকটি 'গীতিমাল্যে' প্রকাশ পাইয়াছে :

> "সবার চেয়ে কাছে আসা
> সবার চেয়ে দূর।
> বড় কঠিন সাধনা, যার
> বড় সহজ সুর।
> পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
> আসে পথিক আপন দেশে,
> বাহির ভুবন ঘুরে মিলে
> অন্তরের ঠাকুর॥
>
> আমি আমায় করব বড়
> এইত আমার মায়া;—
> তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
> ফেলব রঙীন ছায়া।
> তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
> ডাকবে তারে নানাস্বরে,
> আপনারি বিরহ তোমার
> আমায় নিল কায়া॥
>
> এই যে তোমার আড়ালখানি
> দিলে তুমি ঢাকা,
> দিবানিশির তুলি দিয়ে
> হাজার ছবি আঁকা;—
> এরি মাঝে আপনাকে যে
> বাঁধা রেখে বস্‌লে সেজে,
> সোজা কিছুই রাখলেনা, সব
> মধুর বাঁকে বাঁকা॥

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া আসায়
কাটে সকল বেলা॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র

শিক্ষা ও সমাজ *

বারট্রাণ্ড রাসেল অনেকদিন আগে সমাজের পুনর্গঠনের ধারা আলোচনা করিয়া স্বাধীনতার পন্থানির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর শিক্ষার সহিত স্বাধীনতার গভীরযোগ উপলব্ধি করিয়া তিনি সমাজ-গঠন হইতে শিক্ষার ক্ষেত্রে নামেন এবং তাঁহার কল্পিত স্বাধীনতার উপযোগী শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করেন On Education নামক গ্রন্থে। এই ধরণের শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এক বিদ্যালয়ও খুলিয়াছিলেন। সে বিদ্যালয়ের সফলতা বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই; তবে শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার মতামতের বিচারে তাঁহার শিক্ষায়তনের কথা ওঠে না। সম্প্রতি এ বিষয়ে তিনি Education and the Social Order নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শিক্ষার ফিলজফির আর একটু বিস্তৃত ও নূতনতর পরিচয় পাওয়া গেল।

On Education গ্রন্থে তিনি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাসম্বন্ধে যে মত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা অল্পবিস্তরভাবে পাশ্চাত্যজগতের শিক্ষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা অনেক পূর্ব্বেই স্বীকৃত ছিল। শিশুর স্বাধীনতার দাবী সেদেশে অনেকদিন হইতেই শোনা গিয়াছে; এ বিষয়ে রাসেল অগ্রণী নহেন; বরং Rousseau-কে বর্ত্তমানকালে এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলিলে সকলেই হয়ত' ভীত হইয়া উঠিবেন। শিশুকে তাহার নিজের গতিতে নিজের পথে চলিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে একথা এদেশের শিক্ষাধিকারীগণের পক্ষে কার্য্যতঃ স্বীকার করা কঠিন; যদিচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুখে হয়ত' এ মত সমর্থন করিতেও পারেন। এমন কি শিশুর যে নিজের কোন বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার যে জীবন পথে চলিবার নিজস্ব একটি ভঙ্গি আছে বা থাকিতে পারে তাঁহাদের পক্ষে এ কথা মানাই কঠিন হইয়া ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্ব না মানিলে তাহার স্বাতন্ত্র্যের কথা উঠিতে পারে না। রাসেল তাঁহার On Education গ্রন্থে শিশুর স্বাতন্ত্র্যের দাবী

* Education and the Social Order—By Bertrand Russell.

করিয়াছেন এবং তাহার শিক্ষার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তঁ
প্রণালী মনস্তত্ত্বের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (আমাদের দেশের শি
প্রণালীর সহিত মনস্তত্ত্বের বিশেষ যোগ নাই; এমন কি সে যো
থাকা দরকার তাহাও আমরা ঠিক বুঝি না। তবুও গ্রন্থখানি সক
পড়া উচিত।)

On Education গ্রন্থে রাসেল যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়া বি
একদিক্ হইতে তাহার বিচার করিয়াছিলেন Education and
Social Order নামক গ্রন্থে তাহারই অন্য একটা দিক্ হইতে বিস্তৃ
বিচার করিয়াছেন। সমাজ ও শিক্ষার কি যোগ তাহাই বর্ত্তমান গ্র
বিচার্য্য বস্তু।

আলোচ্য গ্রন্থে এই কয়টি অধ্যায় আছে: The Individu
Versus the Citizen; The Negative Theory of Educati
Education and Heredity; Education and Disciplin
Home Versus School; Aristocrats, Democrats a
Bureaucrats; The Herd in Education; Religion
Education; Sex in Education; Patriotism in Educatio
Class-feeling in Education; Competition in Educatio
Education under Communism; Education and Econ
mics; Propaganda in Education; The Reconciliati
of Individuality and Citizenship।

অধ্যায়গুলির নাম পড়িলে হয়ত' মনে হইতে পারে শিক্ষা
আলোচনায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন তত্ত্বই এমন কি যৌন-সম্বন্ধের আলোচ
পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। ধান ভানিতে এই শিবের গীতের বিপুল আয়োজন
শিক্ষার আলোচনায় আপাতপ্রতীয়মান এত অবান্তর বিষয়ের সমাবে
সহসা চমকিত হইয়া ওঠা আমাদের পক্ষে সহজ হইতে পারে; কি
ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারিব ইহাতে বিস্মিত হইবা
কারণ নাই। কারণ, সত্যই শিক্ষার ক্ষেত্র এত সুদূর বিস্তৃত যে তাহা
আলোচনায় ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সকলই আসিয়া পড়ে
Pestalozzi অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, It is life that teach

জীবনই শিক্ষা দেয়; কথাটা শুনিতে মনে হয় অত্যন্ত মামুলি; কিন্তু তাহার যে গভীর অর্থ আছে তাহা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না এবং চোখে পড়িলেও, মুখে স্বীকার করিলেও শিক্ষাপ্রণালীগঠনের সময় এই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে আমরা কার্য্যতঃ অস্বীকার করিয়া চলি। জীবনই একমাত্র শিক্ষক একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে না মানিয়া উপায় নাই যে জীবনে সমাজনীতি, অর্থনীতি, কামনীতি প্রভৃতি যে বিভিন্ন নীতির ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া চলিতেছে শিক্ষানীতির আলোচনায় তাহাদের সকলেরই বিচারের অবশ্যপ্রয়োজন রহিয়াছে। যে দেশে শিক্ষার সহিত জীবনের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ শুধু সেই দেশেই শিক্ষানীতির আলোচনা সংক্ষেপে সারা যায়। অথচ আমাদের দেশেই একদিন শিক্ষাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল, তখন ধর্ম্মের অর্থ ছিল ব্যাপক, শিক্ষার ক্ষেত্রও তাই ছিল সমগ্র জাতীয় জীবনে বিস্তৃত। অর্থ, সমাজ, কাম, মোক্ষ সকলেরই বিচার সেদিন শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থের শিক্ষনীয় বিষয়গুলির যে বিস্তৃত তালিকা দেখিতে পাই তাহার পিছনে জীবনের একটি বিশেষ ফিলজফির পরিচয় রহিয়াছে। তাহার পর জাতীয় জীবনে বিভাগ আসিল, ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সকলেরই ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইল। তাই দেখি আজ যিনি সমাজনীতির চর্চ্চা করেন তাঁহার বিদ্যার সহিত জীবতত্ত্বের বিশেষ যোগ নাই; রাজনৈতিক অর্থনীতির ধার ধারেন না; শিক্ষক শিক্ষাকে শুধু পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। জীবন যে অখণ্ড, একক একথা আমরা ভুলিয়া যাই কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে জীবনকে এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখার একটা প্রয়াস বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বারট্রাণ্ড রাসেল এই ভাবেই শিক্ষানীতিকে সমগ্ররূপে দেখিতে গিয়া নানাবিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

রাসেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, এদিকে আবার তিনি কম্যুনিজ্‌মের পক্ষপাতী; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও কম্যুনিজ্‌ম এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের উপাসনা একসঙ্গে কেমন ভাবে হইতে পারে এ প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই উঠিতে পারে। তাহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে। কোন্‌টার উপর জোর দিব তাহারই উপর উত্তরের প্রকৃতি নির্ভর করে; আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-

বাদী কিন্তু বর্ত্তমান সমাজপ্রণালীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, হয়ত' কম্যুনিজ্‌মের কতকটা কাটছাঁট করিয়া তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠা সম্ভব, তাহাতেই আমার মনোমত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সহজলভ্য হইতে পারে। কম্যুনিজ্‌ম্‌কে আমি ততটাই ভালবাসি যতটা আমার শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হইবে। কম্যুনিজ্‌ম্‌গঠিত সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান না থাকিলেও বর্ত্তমান সমাজে কম্যুনিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী করে, না হইলে কম্যুনিজ্‌মের প্রচার সম্ভব হইবে না ; তাহা ছাড়া শেষ যে লক্ষ্য, সুন্দরতর জগৎ সৃষ্টি করা, সেখানে কম্যুনিষ্ট ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মিলিবে ; তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জগতের ভিত্তি পূর্ণতর ব্যক্তি, কম্যুনিষ্টের জগৎ পূর্ণতর সমষ্টির জগৎ।

সৌভাগ্যক্রমে জীবন ন্যায়শাস্ত্রের বিধান শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া চলে না; তাই জীবনে বিরোধের মিলন দেখিতে পাই ; না হইলে জীবন অচল হইত। ব্যক্তি ও সমষ্টি কোনটাকেই বাদ দিয়া চলে না, একটাকে বাদ দিলে অন্যটাও অচল হইয়া পড়ে। তবে কেহ জোর দেন একটার উপর কেহবা দেন অপরটার উপর। বুদ্ধদেবের মধ্যপথ compromise নহে ; আর যদি তাহা compromise-ই হয় তবে জীবনটাই আগাগোড়া compromise। রাসেল জোর দিয়াছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে সমাজরক্ষার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কতকটা খর্ব্ব করিতে হইবে।

"Individualism, although it is important not to forget its just claims, needs, in a densely populated industrial world, to be more controlled..............than in former times. (২৪৩ পৃষ্ঠা)

"A sense of citizenship, of social co-operation, is therefore more necessary than it used to be ; but it remains important that this should be secured without too great a diminution of individual judgment and individual initiative." (২৪৪পৃষ্ঠা)

সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কতটা খর্ব্ব করিতে হইবে তাহাই লইয়া বিচার।

সমগ্র গ্রন্থে রাসেল দেখাইয়াছেন বর্ত্তমান সমাজধারা তাঁহার মতে কতভাবে জগতের ও ব্যক্তির দুঃখের জন্য দায়ী। তিনি বুঝিয়াছেন বর্ত্তমান সমাজধারা ক্যাপিটালিজ্‌মের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহারই জন্য এত দুঃখ ; ক্যাপিটালিজ্‌মের ধ্বংসের জন্য তিনি বরং কম্যুনিজ্‌মের সহায়তাগ্রহণ করিবেন এবং পরে কম্যুনিজ্‌মের সংস্কার করিয়া তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তির উপর নূতনজগৎ ও নূতন সমাজ গড়িবেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন :

"The establishment of an international authority sufficiently strong to impose its settlement of disputes upon recalcitrant States is, I am convinced, the most important reform from an educational as well as from every other point of view. There are, however, formidable obstacles to the establishment of such an authority, obstacles much more formidable than most pacifists realise.........Until the issue between Communism and Capitalism is decided in one way or another, world peace cannot be secure, whatever machinery may be created. And it is difficult to see how this issue can be decided except by the victory of Communism, at any rate throughout Europe. Capitalism can no longer bring contentment. * * * It seems, therefore, not improbable that the shortest road to world peace lies through Russian propaganda." (পৃষ্ঠা ২৩৩।২৩৪)

অর্থাৎ জগতে একচ্ছত্র এক শক্তির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শান্তি অসম্ভব। ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ সে শান্তি আনিতে পারিবে না, কম্যুনিজ্‌ম্‌ হয়ত' আনিতে পারে। সুতরাং য়ুরোপে অন্ততঃ কম্যুনিজ্‌মের জয় ব্যতীত শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। অবশ্য গ্রন্থের অন্যত্র রাসেল কম্যুনিজ্‌মের বিচার করিয়া তাহার দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মোটামুটি ইহাই তাঁহার সমাজসম্বন্ধে মতামত। এবং সেই মতের অনুযায়ী করিয়া তিনি শিক্ষাপ্রণালীর বিচার এখানে করিয়াছেন।

রাসেলের এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত লইয়া বিচার চলিতে পারে ; কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলা তাঁহার প্রাথমিকসিদ্ধান্তনির্ব্বিশেষে আমাদের প্রণিধানযোগ্য। এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহাদের সহিত

মতের সমস্তটা মিল না হইলেও তাঁহাদের রচনা উপভোগ্য।
তাঁহাদের অন্যতম।

রাসেলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত তাহা হইলে দেখা গেল মোটামুটি প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, দ্বিতীয় ক্যাপিটালিজ্‌মের পরিবর্ত্তে নূ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। দুইটার মধ্যে প্রথমটাকেই এক হিসাবে সর্ব্বপ্রাথমিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, পূ বলিয়াছি রাসেল যে ভাবী সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী তাহারও মূলনীতি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর জগতের ভাবী সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে; আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

গ্রন্থের প্রথমেই রাসেল প্রশ্ন তুলিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শিক্ষা দিব কিসের জন্য, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, না, নাগরিক করিবার জন্য? বর্ত্তমান রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের বাধা পড়ে। আর রাসেল ত' বর্ত্তমান রাষ্ট্রে স্বীকারই করেন না সুতরাং প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া গেল যে ব্যক্তি বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাপ্রণালী সেই উদ্দেশ্যেই হওয়া প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে এই প্রশ্নের সুদীর্ঘ বিচারে অবশ্য নাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাপ্রণালীর সৃষ্টি তাহার সমালো করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ব্যক্তির মঙ্গল কিসে এ প্রশ্নেরও দিয়াছেন; তাঁহার কল্পিত পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিত্বের আদর্শের বিচার এ প্রয়োজন নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে এইভাবে পূর্ণবিকশিত ব্য সহিত বর্ত্তমানকালীন রাষ্ট্রের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং উভয়ের স্বার্থ (ব রাষ্ট্রবিধিতে) এক নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা সুন্দর কথা বলিয়াছে

"The English admire Boadicea, whom they would t exactly as the Romans did if she were to appear in mo India" (পৃষ্ঠা ১৩)।

নাগরিক সৃষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলে জগতের দুঃখ স্থায়ী করা হইবে, সমাজবিধির পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। কোন রাষ্ট্রই বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চাহেনা। তাহা ছাড়া এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলে

একটা অভাব হইবে; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মূলে রহিয়াছে জিজ্ঞাসার ভাব; বৈজ্ঞানিক না বুঝিয়া কোন কিছু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। পরিবর্ত্তনের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি; সুতরাং নাগরিকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠিত শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার্থীর অন্তরে এই জিজ্ঞাসার ভাব জাগাইতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিক রাসেলের এই প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধে ইহাও একটা মস্তবড় যুক্তি। এই অধ্যায়ের উপসংহারে রাসেল কিন্তু সাবধানী হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক শিক্ষার এই আদর্শের খানিকটা গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

"Education in citizenship has grave dangers. Nevertheless, the argument in favour of some education to produce social cohesion is overwhelming."

এখানে তিনি social cohesion-এর উদ্দেশ্য বিচার করিয়া বলিয়াছেন সমগ্র জগৎকে অখণ্ডভাবে দেখিবার যে বোধ, নিখিলবিশ্বের নাগরিক হইবার যে বুদ্ধি, তাহা একান্ত প্রয়োজন।

"When once the world as a single economic and political unit has become secure, it will be possible for individual culture to survive. But until that time our whole civilisation remains in jeopardy. Considered *sub specie aeternitatis* the education of the individual is to my mind a finer thing than the education of the citizen; but considered politically, in relation to the needs of time, the education of the citizen must, I fear, take the first place.

অবশ্য এখানে তিনি নাগরিক শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কেন ব্যক্তির শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন তাহাই বিচার করিয়াছেন এবং আবশ্যিক শিক্ষার দোষ দেখাইয়াছেন। যেখানে আমরা একটি শিশুকে চাপ দিয়া শাস্তি দিয়া ভাল কাজ করিতে শিখাই সেখানে আমরা মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক সত্যকে অবজ্ঞা করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে শাসন ও সংযম এক নহে, সংযম আত্মজাত ও শাসন বহির্জাত। বহির্জাত শাসনের ফলে আজ না হয় আমাদের অন্তরস্থিত নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি বিকাশ লাভ করিল না, কিন্তু সেগুলি অবচেতনায় প্রচ্ছন্ন আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং পরে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া কদর্য্য পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া

আমাদের জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিল। ফ্রয়েডের আ অবচেতনার প্রভাব আমাদের জীবনে কি ভাবে কতভাবে কাজ করি তাহা আমরা এখনও বুঝি না।

অবশ্য রাসেল স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের পার্থক্যবিচার করিয়া শিশুকে কোন্ বিষয়গুলি কতকটা জোর দিয়া শিখাইতে হইবে স তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার মত, শিশুকে স্বা দিতে হইবে, তাহার শিক্ষায় তাহার বিরুদ্ধাচরণের পরিবর্ত্তে সাহচ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বারট্রাণ্ড রাসেলের এই সিদ্ধান্ত বোধ কোন শিক্ষাতাত্ত্বিকই অস্বীকার করেন না।

বর্ত্তমানে সমাজে যে শ্রেণীর ধন ও বংশগত অভিজাত্য রহি রাসেল তাহার বিরুদ্ধে। তিনি অবশ্য বুদ্ধির আভিজাত্য স্বীকার ও করেন; এইজন্যই যে শিশু বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে স্ব শিক্ষার জন্য তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থার বিধান দিয়াছেন। ধনাভিজাত্য বংশাভিজাত্য কিভাবে শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার বি প্রসঙ্গে তিনি বংশানুক্রমের (heredity) বিচার করিয়াছেন। এ বি তিনি সুপ্রজনন-বিদ্যার সমর্থকদের মতের কতকটা খণ্ডন করিয়া বলিয়া শিক্ষার প্রভাব বংশানুক্রমের প্রভাবের চেয়ে কম ত' নহেই বরং বে নিছক বংশানুক্রমবাদীছাড়া সকলেই বোধ করি রাসেলের এমতের পোষ করিবেন।

ইহার পর কথা উঠিয়াছে discipline বা শাসন লইয়া। Discipl অর্থে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহা বাহ্যবস্তু; অবশ্য যদি discipline-এর অর্থ ব্যাপক করিয়া স্বনিয়ন্ত্রণকেও ইহার মধ্যে আ ফেলেন তবে কোন তর্কই উঠে না; কিন্তু মুখে সে অর্থ স্বীকার করি কার্য্যক্ষেত্রে আমরা discipline-এর অর্থ করিয়াছি বাহির হইতে শা এই শাসনের সহিত পুরস্কার তিরস্কারের গভীর যোগ আছে। আমা শিক্ষাপ্রণালী শাসনের বেড়াজালে এমনই ভাবে আবদ্ধ যে আ আচারকেও বাহিরের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। শাসন ক বাহ্য আচার কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সত্য কিন্তু সে আ

চিরদিনই বাহ্য ব্যাপার থাকিয়া যায়। ইহাকে ভিতরের বস্তু করিতে গেলে শাসনছাড়া অন্যপথ অবলম্বন করিতে হয়। অবচেতনা সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকগণের ও রাসেলের মত পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন পুরস্কার তিরস্কারের শাসনে সত্যাচারের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয় না; জীবনে দ্বন্দ্ব থাকিয়াই যায়। সুতরাং শিশুকে কতকটা তাহার অলক্ষ্যে ও কতকটা তাহার সাহচর্য্যে এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হইবে যে সে সহজেই স্বনিয়ন্ত্রণ শেখে, বাহ্য শাসনদ্বারা তাহাকে শিখাইবার প্রয়োজন হয়ই না।

মানুষের সামাজিক জীবনের মূলে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চলিতেছে, দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা। দ্বন্দ্বও যেমন সহযোগিতাও তেমনি মানুষের সহজাতবৃত্তি। বর্ত্তমানকালের রাষ্ট্র ও সমাজে কিন্তু প্রতিযোগিতা অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বৃত্তিরই বিশেষ আদর। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" ইহাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজের নীতি। যন্ত্রমূলক সভ্যতার প্রথম যুগে রাষ্ট্র যখন যান্ত্রিক উন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল তখন এই নীতির কতকটা প্রয়োজন ছিল। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিও কতকটা এই নীতির ফল বলা যাইতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতির ক্রিয়া আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি; পুরস্কার-তিরস্কার নীতিও এই নীতির প্রতিধ্বনি মাত্র। যে ছাত্র যোগ্য তাহার আদর ও অযোগ্য যে তাহার অনাদর শিক্ষকমাত্রেই প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে করিয়া থাকেন। ইহার ফল কতদূর গড়ায় তাহা হয়ত অনেকেই ভাবেন না। তাঁহারা একথাও বলেন যে অযোগ্যের অনাদর করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, শুধু যোগ্যের সম্মান তাঁহারা দিতে চাহেন। তাঁহাদের সরলচিত্ততায় সন্দেহ নাই করিলাম; কিন্তু দশটি শিশুর মধ্যে তাঁহারা দুইটিকে পুরস্কার দিয়া অপর আটটিকে পরোক্ষভাবে যে অপমান করেন তাহা তাঁহাদের মনে আঘাত করিতে না পারে কিন্তু শিশুচিত্তে তাহা কতটা বাজে তাহা বোধ করি যে কেহ শিক্ষাজীবনে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন। বাল্যকালে এক পুরস্কার বিতরণ সভায় একজন শ্রদ্ধেয় বক্তাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম failures are the pillars of success অর্থাৎ পরাজয়ের ভিত্তির উপর জয়ের প্রতিষ্ঠা। কথাটা শুনিতে

মন্দ লাগে না কিন্তু তাহার সারবত্তা কয়জনের জীবনে সত্য ? অতি অ
সংখ্যক শিশু আছে যাহারা বার বার ঘা খাইয়াও উদ্যমহীন হইয়া পড়ে না
বাকি যাহারা আঘাত-অসহিষ্ণু বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে যোগ্যতমে
উদ্বর্ত্তন নীতির আদর সেখানে, তাহারা সমাজের অতিঅল্প কাজেই লাগে
ব্যর্থতায়, অপমানে তাহাদের সামান্য যেটুকু শক্তি আছে—হয়ত' যাহার অনুশীলন
করিলে তাহারা আরো শক্তিশালী হইতে পারিত—তাহাও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।
ইহার অর্থ নহে যে জীবনে তারতম্য ভেদাভেদ লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে।
যে কোন সমাজেই—এমন কি কম্যুনিষ্ট সমাজেও যোগ্যতমকে বাছিয়া
সমাজের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাহাদেরই উপর দিতে হইবে। কিন্তু
তাহাদের সংখ্যা চিরদিনই অল্প হইবে, বাকিকে লইয়াই কথা। কিভাবে
তাহাদের ক্ষীণ শক্তির পূর্ণতম বিকাশ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে
হইবে। রাসেলের সহিত আমরা এ বিষয়ে একমত যে প্রতিদ্বন্দ্বনীতির
আশ্রয় গ্রহণে এ উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বনীতিই আজ
সকল দেশের সকল সমাজে বলবৎ রহিয়াছে। তাহার অন্যথা না হইলে
শিক্ষার ক্ষেত্রেও অন্য নীতির অনুসরণ সম্ভব নহে। একমাত্র সোভিয়েট
রাশিয়ার নূতন সমাজ-গঠনে অন্য নীতি অনুসৃত হইয়াছে; তাই এবং শুধু
সেই কারণেই রাসেল কম্যুনিজ্মের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি কম্যুনিজম ও
শিক্ষা-শীর্ষক অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিভাবে অন্য নানা কারণে
কম্যুনিজ্মের আমলেও তাঁহার মনোমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না। মানসিক
স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, যাহা রাসেলের শিক্ষার চরম লক্ষ্য, কম্যুনিজ্ম
সে-স্বাধীনতা দিতে নারাজ। সে কম্যুনিজ্মের পক্ষে "প্রোপাগ্যাণ্ডা"
করিবে; কিন্তু যেখানেই "প্রোপাগ্যাণ্ডা" সেখানেই স্বাধীনতা অগ্রাহ্য।
ধর্ম্ম এমনই এক রকম "প্রোপাগ্যাণ্ডা", তাঁহা মানুষের সহজ বুদ্ধিকে পরা-
ধীনতার বেড়াজালে নানাভাবে বাঁধে, রাসেলের এই মত, সুতরাং তিনি শিক্ষায়
ধর্ম্মের স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। গোষ্ঠীও ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে চাহে
না, পরোক্ষে হউক, প্রত্যক্ষভাবে হউক গোষ্ঠী নিজের মত ব্যক্তির উপর
চালাইতে চাহে; সুতরাং সে রকমের "প্রোপাগ্যাণ্ডা" হইতেও ব্যক্তিকে
শিশুচিত্তকে মুক্তি দিতে হইবে, ইহাই রাসেলের মত। অবশ্য তিনি প্রত্যেক

শিশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করিতে চাহেন না। তিনি সাবধানী, জীবনটাই যে নানাভাবে suggestion দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং সে suggestion-এর সবটাই যে খারাপ নহে একথাও তিনি স্বীকার করেন। জীবন ভরিয়াই নানাভাবের "প্রোপাগ্যাণ্ডা" চলে, পরিণতবয়স্ক পিতামাতা নানাভাবে তাহাদের জীবন দিয়াই এই "প্রোপাগ্যাণ্ডা" চালান, এবং এরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডার হাত হইতে মুক্তি নাই এবং তাহার সবটাই যে খারাপ নহে তাহা রাসেল স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চাহেন যতটুকু সম্ভব সেই "প্রোপাগ্যাণ্ডা"কে কম করিতে হইবে। ধর্ম্মের সম্বন্ধে রাসেলের যে উক্তি তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন না, তবুও এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি প্রণিধান-যোগ্য, তাহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান সমাজের গঠন-পদ্ধতি; আর রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের বিরোধ আজিকার আন্তর্জাতিক নীতি। তাহারও মূলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বনীতি; রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাহার রূপ হইয়াছে স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেমও এক প্রকার "প্রোপাগ্যাণ্ডা"। স্বদেশপ্রেমের দুইরূপ—আমি আমার দেশকে ভালবাসি, এ একপ্রকারের স্বদেশপ্রেম, ইহাতে ভেদাভেদ বুদ্ধি নাই, তোমার দেশ ছোট বা বড় তাহার প্রশ্নই ইহাতে উঠে না। কিন্তু আর এক প্রকারের স্বদেশপ্রেমের মূলে বিদেশের প্রতি ঘৃণা বিদেশকে ছোট করিয়া দেখার ভাব রহিয়াছে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া ইম্পীরিয়ালিজ্মে পরিণত হয়; whiteman's burden সেই প্রকারের নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমের ফল। মূলতঃ স্বদেশপ্রেম এই দুই প্রকারের হইলেও কার্য্যতঃ আমরা শেষোক্তশ্রেণীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাশ্চাত্যদেশে পদে পদে পাই।

রাসেল এই প্রকারের স্বদেশপ্রেমের ঘোরতর বিরোধী। বিদেশের ঈর্ষা ও ঘৃণা-উপজাত এই স্বদেশপ্রেমই আজ জগতের সকল দুঃখের জন্য দায়ী। তাহারই জন্য আজ অস্ত্রনিরাকরণ-বৈঠক ব্যর্থ হয়, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ পঙ্গু হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই স্বদেশপ্রেমের আদর্শের অখণ্ড প্রতাপ। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়া আমরা সত্যের অপলাপ করিতে, শিশুচিত্তকে মিথ্যা মতের দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ

করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না। যদি কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যায় তাহাকে অবজ্ঞা করিতে, শাসন করিতে, defeatist বলিয়া উপহাস করিতে দ্বিধা করি না। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি দ্বারা এরূপ চেষ্টাকে চূর্ণ করিতে আমাদের লজ্জা আসে না। জগতে যতদিন এ শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমের প্রভাব থাকিবে ততদিন শান্তি নাই ; শিক্ষার মুক্তি, চিত্তের স্বাধীনতা, অপ্রতিহত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সত্যানুসন্ধানের উপায় নাই।

সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া এক রাষ্ট্রের স্থষ্টিই এই দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়। সেইরূপ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ওয়েলস্ ও অন্যান্য মনীষীগণ করিয়াছেন ; কিন্তু সে কল্পনা কোন দিন সার্থক হইবে কি না কেহ বলিতে পারে না, অন্ততঃ বর্ত্তমানকালে পরস্পর-ভীতি ও হিংসাপ্রপীড়িত জগতে তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

বারট্রাণ্ড রাসেল তবুও সাহস হারান নাই ; শিক্ষার উপর তাঁহার সমূহ বিশ্বাস। শিক্ষাকে স্বাধীন করিলে চিত্তে স্বাধীনতা আসিবে এবং স্বাধীনচিত্ত সহযোগিতার আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত মানুষকে দিয়াই ভাবী সেই সমাজ গড়িয়া উঠিবে যেখানে আজিকার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

গ্রন্থের উপসংহারে রাসেল যে কয়টা কথা লিখিয়াছেন তাহা দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন :

"Our world is a mad world. Ever since 1914, it has ceased to be constructive, because men will not follow their intelligence in creating international co-operation, but persist in retaining the division of mankind into hostile groups. This collective failure to use the intelligence that men possess for purposes of self-preservation is due, in the main, to the insane and destructive impulses which lurk in the unconscious of those who have been unwisely handled in infancy, childhood and adolescence. Inspite of continually improving technique in production, we all grow poorer. Inspite of being well aware of the horrors of the next war, we continue to cultivate in the young those sentiments which will make it inevitable. Inspite of Science, we react against the habit of considering problems rationally. Inspite of increasing command over nature, most men feel more hopeless and impotent than they have felt since the Middle Ages. The source of all this does not lie in the external world, nor does it lie in the purely cognitive part of our nature, since we know more than men ever knew before. It lies in our passions; it lies in our emotional habits; it lies in the sentiments instilled in youth and in the phobias created in infancy. The cure for our problem is to make men sane, and to make men sane they must be educated sanely. At present the various factors we have been considering all tend towards social disaster. * * The world has become so intolerably tense, so charged with hatred, so filled with misfortune and pain that men have lost the power of balanced judgment which is needed for emergence from the slough in which mankind is staggering. Our age is so painful that many of the best men have been seized with despair. But there is no rational ground for despair; the means of happiness for the human race exist, and it is only necessary that the human race should choose to use them." (পৃষ্ঠা ২৪৬-৪৮)

অর্থাৎ আজ আমরা পাগলের জগতে বাস করিতেছি ; সেখানে দুঃখ দ্বন্দ্ব বিরোধ বুদ্ধিভ্রংশ দিন দিন দুঃখ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। এদিকে আমাদের সুখশান্তির আয়োজন অসীম রহিয়াছে। পানীমে থাকিয়াও মীন এই যে পিয়াসী হইয়া রহিয়াছে ইহার মূল কারণ বাহিরে নহে আমাদেরই অন্তরে। কুশিক্ষার জন্য আমাদের অবচেতনায় যে নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি একদা সুপ্ত ছিল বাহিরের সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারই ক্রিয়ায় জগতে এই দুঃখের উৎপত্তি। আমাদের শুভবুদ্ধি সেই অবচেতনাস্থিত নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির নিকট পরাজিত।

আমাদের অন্তরস্থিত শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার একমাত্র উপায় সুশিক্ষাদান। আজ নৈরাশ্যের বহু কারণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের সাহসে বুক বাঁধিতে হইবে ; কারণ, নৈরাশ্যনিরাকরণের উপায় আমাদেরই হাতে রহিয়াছে। এখন প্রয়োজন শুধু সেই উপায় প্রয়োগ।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

“ফাউষ্ট” *

ব্যক্তির জীবনে দেখি এক বয়সের একটি আইডিয়া দিন দিন
হতে হতে পরবর্ত্তী বয়সে যেই সম্পূর্ণ হয় অমনি সমাপ্ত হয়।
মনের ভিতর তার খোঁজ পাওয়া যায় না, তার আশ্রয়স্থল তখন স্মৃতি।

জাতির জীবনেও সেইরূপ। তবে জাতির জীবন হচ্ছে বড়
ব্যাপার। যেমন তার আকার তেমনি তার আয়ু। তার সামান্য
শতাব্দীর ইতিহাসে কত ঘটনা, কত অঘটন, কত রাজ্য ভাঙাগড়া, কত
অভ্যুদয়। এত কিছুর মধ্যেও এক একটি আইডিয়া জাতির মানসে
লাভ করছে। পরিশেষে একটি অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে, একটি
বা বিপ্লবে, একখানি কাব্যে বা কীর্ত্তিতে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে এমনি একটি আইডিয়া ছিল সয়তানের
চুক্তি। সয়তানকে লোকে ঘৃণা করত, গাল পাড়ত, ভয় করত
সয়তানের আকর্ষণও তলে তলে অনুভব করত। ফাউষ্ট নামে
এক পণ্ডিত নাকি সয়তানের কাছে পরকাল বিক্রয় করে ইহকালে
শক্তি কিনেছিল। অতবড় যাদুকর নাকি আর ছিল না। মুখে
মুণ্ডপাত করলেও মনে তার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল সকলের। তার
রচিত হয়েছিল অনেক গ্রন্থ, চলিত হয়েছিল অনেক কাহিনী,
হয়েছিল অনেক পালা। সেগুলিতে তার শোচনীয় পরিণাম—তার
ও সয়তানের অধিকারে তার আত্মার দুর্গতি—আঙ্গুল দিয়ে দেখানো
বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন লোকটা যে সুখের জীবন, সখের জীবন, যখন-
জীবন কাটিয়ে গেল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল সাড়ম্বরে।

ফাউষ্ট হতভাগাটা যে অমন একটা চুক্তি করে নিতান্তই ঠকে
মধ্যযুগের শেষভাগের মানুষ অন্তরে তা স্বীকার করতে পারছিল
পরকালের ভয় যতই কমে আসছিল ইহকালের সম্ভাবনা ততই বৃহৎ
হচ্ছিল। বিজ্ঞান এল, প্রকৃতির বস্ত্রহরণ হতে থাকল, সয়তানী

* পরিকল্পিত পুস্তক "ইউরোপের বাণী" থেকে।

সাহায্যে এঞ্জিনিয়ার একে একে বহু অসাধ্যসাধন করল। তখন যাদুকর
ফাউষ্টের উপর শ্রদ্ধা জাত হল। সয়তানের খুর, লাঙ্গুল ও শিং খসে
গেল। সয়তান বলা হল বিশ্বসংসারের অন্তর্নিহিত সেই পরশ্রীকাতরতাকে
যা অহরহ ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে দেয়, যজ্ঞ পণ্ড
করে, ভালকে দিয়ে ভালর সর্ব্বনাশ ঘটায়। এমন যে সয়তান সে মানব-
সংসারে ভদ্রবেশী।

কালক্রমে ফাউষ্ট ও সয়তান উভয়ের বিবর্ত্তন হয়েছিল জনগণের
কল্পনায়। Goethe যখন উভয়ের চুক্তির আইডিয়াটিকে পূর্ণতা দিয়ে চুকিয়ে
দেবার সঙ্কল্প করলেন ততদিনে ফাউষ্টের পরিণাম-সম্বন্ধে লোকের রুচি
বদলেছে। লেসিং বল্লেন, ফাউষ্টের ত স্বর্গে যাবার কথা। মৃত্যুর পরে
তার আত্মা সয়তানের খপ্পরে পড়বে এ যে অসহ্য।

অথচ যে মানুষ সাক্ষাৎ সয়তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মর্ত্ত্যকেই
পরম বলে গণ্য করল, স্বর্গের চিন্তা মনে আনল না, তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলে
পাপ পুণ্যের পরিমাণ ভেদ থাকে না। আর সয়তানকেও তার শিকার থেকে
বঞ্চিত করলে অন্যায় হয়। Goethe এই সমস্ত কারণে চুক্তির মধ্যে একটি
ফ্যাঁকড়া রাখলেন। ফাউষ্ট বল্ল সয়তানকে, “তুমি আমাকে যা দেখাবে যা
দেবে যেখানে নিয়ে যে অবস্থায় রাখবে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ
হয়, তাতে যদি আমি আসক্ত হই তবেই আমার আত্মা তোমার হবে।”
সয়তান জানত মানুষের বাচ্চার দৌড় কত দূর। বল্ল, “বহুৎ খুব।” শেষ
পর্য্যন্ত সয়তান ফাউষ্টের সঙ্গে পারল না। ফাউষ্ট বলে, “হেথা নয় হেথা
নয়, অন্য কোনোখানে।” কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। “নেতি, নেতি।”
একশ বছর বয়স হল, তবু সে নিরলস, নিত্য উদ্যত। একটু আরাম কি
বিশ্রাম তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বাদু করল না। তার অন্তহীন চলার
মাঝখানে এল মৃত্যু। এমন মানুষের আত্মার উপর কি সয়তানের কর্ত্তৃত্ব
সম্ভব, না সঙ্গত?

তবু সে স্বর্গে যেতে পারে না। স্বর্গে যাবার পক্ষে তার যোগ্যতা
যথেষ্ট নয়। সে পাপে আটকে থাকেনি বটে, কিন্তু পাপের জন্য সে অনুতপ্ত
নয়, পুণ্যের প্রতি তার আগ্রহ নেই। পুণ্যের প্রতি সে একদিন আকৃষ্ট

হয়েছিল, পুণ্যবতীতে অনুরক্ত হয়েছিল, সয়তানের প্রেরণায় সেই পুণ্যশী ভ্রষ্টা করে পলায়ন করেছিল। তার সেই প্রিয়া তার হয়ে প্রার্থনা ক কুমারী-জননীর সকাশে, কুমারী-জননীর করুণাকে তার প্রতি উন্মুখ ক ভাগবত করুণায় হল ফাউস্টের স্বর্গলাভ।

এইখানে Goethe-এর "ফাউস্টের" বিশিষ্টতা। ফাউস্টের আখ্যা মধ্যে গ্রেচেনকে—কল্যাণীকে, সতীকে—প্রক্ষিপ্ত করলেন তিনিই। বিবর্ত মধ্যে এই তাঁর প্রবর্ত্তন। এর দ্বারা বিবর্ত্তনের সমাপ্তি ঘট্‌ল, ফাউ পরিণাম হল চিরকালের সর্ব্ব মানবের অভিলষিত।

এ ছাড়া তিনি আখ্যানটিকে যথেচ্ছ পল্লবিত করলেন। শতাব্দীকাল তাঁর দ্বারা পল্লবিত হতে হতে আখ্যানটি হয়ে উঠ্‌ল উপ মাত্র। মানবাত্মার মহানিয়তিকে সূত্র করে গ্রথিত হল রাজনীতি, অর্থ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, করুণাতত্ত্ব, সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তনবাদ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ম শিশু-নির্ম্মাণ, সমুদ্র-শোষণ করে ভূখণ্ডবিস্তার ইত্যাদি প্রাচীন ও আধু ভাবনা। Goethe-র "ফাউস্ট" যেন একখানি মহাভারতসার।

লোক-সাহিত্যকে সাহিত্যে—প্রাকৃতকে সংস্কৃতে—উন্নীত ক উদাহরণ এই প্রথম নয়। কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যাম প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডীসকল মূলত লোকমনের কল্পনা। প্রতিভাশা লোক-কল্পনার অসম্পূর্ণ আলেখ্যের উপর তুলিকা স্পর্শ করে তা চিরকালের মত সম্পূর্ণ করে দেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লোক-সত্তা মর্য্যাদা রক্ষা হয়, প্রতিভাশালীকে কালের বিচার-সম্বন্ধে সন্দিহান হতে না। আমার একার জিনিষ সকলের হাতে দিলে আমাকে ঝুঁকি নিতে কে জানে হয়ত ওরা আমার অসাক্ষাতে ওর তত্ত্ব নেবে না। সকলের জিনিষ আমার হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফিরিয়ে দিলে সকলের হয়ে থাকবে—উ আমার হয়ে থাকবে। কালিদাস বা শেক্‌স্‌পীয়ার বা Goethe যদি বিষয়বস্তু নিজের হাতে বানাতেন তবে সেটা হত একটা এক্সপেরি যার কাজ শাড়ীর পাড়ে ফুল তোলা তার পক্ষে শাড়ী বোনার মত। অনা শক্তিক্ষয় ত হতই, তার পর সে এক্সপেরিমেণ্ট্‌ কখনোই নিপুণ হস্তের নি হত না। প্রতিভাশালীদেরও অধিকারের সীমা আছে। সীমার

গিয়ে শক্তিক্ষয় করতে তাঁরা স্বভাবত পরাঙ্‌মুখ। অবশ্য সীমার অর্থ কৃত্রিম গণ্ডী নয়। সীমা হচ্ছে স্বধর্ম্মের সীমা।

বহু জনের পায়ে চলার পথ বহু দিনের পরীক্ষিত। নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নূতন একটা পথ না কেটে সেই পথে চল্‌তে প্রতিভাশালীদের দ্বিধা নেই। তাঁরা জানেন যে তাঁদের ব্যবহারের দরুণ প্রাচীন পথ চির-নবীন বলে মনে হবে। তাঁদের স্বীকৃতির দরুণ গ্রাম্য পথ রাজপথ বলে গণ্য হবে।

Goethe-র "ফাউস্ট" কাব্য কিম্বা উপন্যাস না হয়ে নাটক হল কেন?—কাব্যের প্রাণ বেদনা, উপন্যাসের প্রাণ বিবরণ, চিত্রের প্রাণ বর্ণনা, নাটকের প্রাণ সঙ্ঘটন। লোকচিত্তের ফাউস্টে বেদনা ছিলনা, বেদনার সূচনা করলেন Goethe স্বয়ং—গ্রেচেনের প্রেমে, বিষাদে, উন্মাদে। কিন্তু কাব্যের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়; বিষয়ের মর্ম্ম নয় সে। আর উপন্যাসের পক্ষে যা প্রাণস্বরূপ তা ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার বিবরণ। লোকচিত্তের ফাউস্ট ক্রিয়ারত। তাই ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোজনা নিয়ে Goethe-র "ফাউস্ট" হল নাটক। তার সবগুলি বাইরের ঘটনা নয়। বাইরের যেগুলি সেগুলি যথাযথ নয়। কোথায় ঘট্‌ছে, কবে ঘট্‌ছে—এ সমস্ত গৌণ। ঘট্‌ছে—এইটে মুখ্য। ফাউস্ট ত মধ্যযুগের মানুষ। সে ধরে রাখ্‌ল প্রাগৈতিহাসিক হেলেনাকে। তাদের যে সন্তান হল সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠ্‌ল, উড়তে গিয়ে মারা গেল। যেন বাস্তব নয়, ইন্দ্রজাল। যাঁরা সাধারণ নাটকের মত করে "ফাউস্ট" পড়্‌বেন তাঁরা বাস্তব ও ইন্দ্রজাল এর একটার থেকে অপরটাকে পৃথক না করতে পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হবেন। ইন্দ্রজালের গুণ, তা অসম্ভবকে সম্ভব বোধ করায়। দেশকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। রূপকথা ও ইন্দ্রজাল, এদের জাত এক। লোকচিত্তের ফাউস্ট ত ঐন্দ্রজালিক, তার কাহিনী রূপকথা। সয়তান যে ভদ্রলোক সেজে এল এ যদি বিশ্বাস হয় তবে হেলেনা ও ফাউস্ট যে মিলিত হল ও সেই মিলন যে সন্থফলপ্রদ হল এতে অবিশ্বাস অরসিকত্ব।

বহির্বিশ্বে ও অন্তর্বিশ্বে যে দুটি—ও দুই জড়িয়ে একটি—ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে সেই ঘটনা পরম্পরা-সম্বন্ধে বিশেষ বোধ না থাকলে "ফাউস্ট" কিম্বা কোন বিশুদ্ধ নাটক বোঝা যায় না। সাধারণত অভিনয় আমরা দেখি

উপন্যাসের। পড়ি আমরা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে গল্প। তার সঙ্গে
ছবি মেশানো। এদানী ছবির ভাগ বেড়েছে। সাজ-আসবাব অ
ইত্যাদির উপর থাকে চোখ আর কথাবার্ত্তার দিকে যায় কান। এর
নাট্যবোধ কোথায়; ষ্টেশনে পৌছতে একটি মিনিট দেরি হয়ে গেছে সা
দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে কিছুই করতে পারছিনে, অনড় হয়ে অনিমেষ ন
চেয়ে আছি, নিজের এই অসহায়তা মন্দও লাগছে না বুক যেন ট্রেনের চ
সঙ্গীতে তাল দিচ্ছে—এই ত নাট্যবোধ।

পুত্তলিকার অভিনয় Goethe-র আশৈশব প্রিয় ছিল। এক অ
হস্ত ঝুলন্ত পুত্তলীদের চালন করছে, তাদের মুখের কথা অপরে বলে যা
তাদের অঙ্গভঙ্গী কৌতুককর অথচ মুখভাব অবিকৃত। চরিত্রের বিক
নেই, কিন্তু ঘটনার লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যাভিমুখিত্ব নাটকের ধর্ম্ম। গল্পে
এটা একটা গুণ, কিন্তু গল্পের ধর্ম্ম তার বিস্তার তার অপ্রাসঙ্গিকতা। পা
কথকরা কি কিছুতে গল্প শেষ করতে চান্; কিম্বা গ
শেষটা ফাঁস করে দিতে? নাটকের শেষ কিন্তু আন্দাজ করা যায়।
জেনে নিয়েও আমরা নাটক দেখতে কম আগ্রহী হইনে। এর প্র
কারণ আমরা নিজকে ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভাবে ভেসে যেতে ভালবাসি,
আর মরি। ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে পড়ে পিছনের চাপে আপনা-আপ
এগিয়ে যাবার রোমাঞ্চ আমাদের অস্থির করে। তাই ভিড় দেখে
ভিড়ে যাই। বিশুদ্ধ ঘটনার টান যেন সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের গ্রাস।
নেই জেনেও নিজেকে সাম্লাতে পারিনে।

"ফাউষ্টে" অনেক রকম অনেক ভিড়। নাগরিকদের উৎ
ডাকিনীদের শিবরাত্রি (walpurgis night), পরীরাজ্যের স্বপ্ন, মহা
সভা, পারিষদগণের ছদ্মবেশবিলাস, পৌরাণিক গ্রীসের শিবরাত্রি, হেলে
কোরাস, রাজশিবির, কুমারীজননীর আশ্রম—প্রত্যেকটিতে অগণিত ব্যক্তি
আবর্ত্তন, গতিচাঞ্চল্য, কলগুঞ্জন। এদের বিচিত্র সত্তাও ঘটনার সামি
ফাউষ্ট এদের মধ্যে পড়ে যেন আপনা-আপনি এগিয়ে চলেছে।
মেফিষ্টোফেলিস—সয়তান। তার কাজ হল কথায় কথায় ব্যঙ্গ, উপহা
অবজ্ঞা, কুৎসিত সমালোচনা।

"ফাউষ্টের" দুই প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে—একটি তাৎকালীন, অন্যটি নিত্যকালীন। তাৎকালীন ব্যাখ্যাটি এই। মধ্যযুগের মানব থিওলজির তত্ত্বকেই সত্য বলে বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাস তাকে একান্ত আশ্বাস দিত। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। এমন সময় রিনেসেন্স এসে তার মনে জাগিয়ে দিল সৌন্দর্য্যের ধ্যান, জ্বালিয়ে দিল অনির্ব্বাণ সংশয়। সে যে কত পুঁথি পড়্‌ল তার সুমারি হয় না। এত পড়েও যার দিশা পেল না তার জন্য ভানুমতী শিখ্‌ল, যে পন্থা দুর্গম তাকে আরব্য উপন্যাসের ভৌতিক আসনে বসে আশু অতিক্রম কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ল।

সংশয়ের নাম সয়তান। সয়তান হচ্ছে জিজ্ঞাসা, চ্যালেঞ্জ, বিদ্রোহ, ছিদ্রান্বেষ, অভিমান। সয়তানকে গোলাম করে, গুরু করে, মধ্যযুগের মানব আধুনিক হয়ে উঠল। হল বৈজ্ঞানিক হল যন্ত্ররাজ, ছেঁচল সাগর, কাট্‌ল (সুয়েজ পানামা) খাল, আশা রাখল আকাশে ওড়্‌বার, অভিপ্রায় কর্‌ল মানবশিশু নির্ম্মাণের; সম্ভাবনার অবধি নেই, আধুনিক মানব কোনখানে থাম্‌বে? কতদূরে গিয়ে বল্‌বে, এই আমার সামর্থ্যের সীমানা, এই পর্য্যন্ত জয় করে আমি নিশানা রেখে দাঁড়ি টান্‌লুম। আধুনিক মানব জীবনকর্ম্মে ক্ষান্তি না দিতেই আসে মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি সে অনুতাপে দগ্ধ হবে? গ্লানি বোধ কর্‌বে, লজ্জিত হবে? না। যদিও সে স্বর্গকামনা করেনি, ভগবানকে ডাকে নি, তবু সেও ভাগবত করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উন্নতমনা, নিরলস, নিরাসক্ত। সে ত উর্দ্ধাভিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কেউ কি তার হাত ধরে তাঁকে তুলে নেবে না? নেবে।

মানুষ আপন চেষ্টায় ত্রাণ পেতে পারে না, তাকে ত্রাণ করবার জন্য স্বর্গ থেকে করুণা নেমে আসে। এমনিতে কোনো ব্যক্তি করুণার যোগ্য নয়, শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাও নন্। করুণা কেউ দাবী কর্‌তে পারে না; সেটা প্রভুর খুসীর খয়রাৎ। এই হল খ্রীষ্টীয় করুণাতত্ত্ব, grace-এর কথা। এই তত্ত্বের সঙ্গে Goethe একরকম সন্ধি কর্‌লেন। যদিও প্রকৃত পক্ষে করুণা হল ভগবানের অহেতুক দান, তার পাত্রাপাত্র নেই, তবু সচেষ্ট ব্যক্তি তার আশা রাখ্‌তে পারে। ফাউষ্টের মত কর্ম্মী তার দ্বারা অবশেষে ত্রাণ লাভ করে থাকে। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ফাউষ্ট তাই

করতে করতে ঠিক একশ বছর বেঁচেছিল। তার একটা গতি না
খ্রীষ্টীয় ভগবান আধুনিকদের নিকট মুখ দেখাবেন কি করে?

ক্রিশ্চিয়ানিটীর সঙ্গে ত এই মর্ম্মে সন্ধি হল। কিন্তু মধ্যযুগের মা
ছিল তে-টানা। টান্‌ছিল তাকে অযুত সম্ভাবনাবিশিষ্ট ভবিষ্যৎ—প্র
উপর কর্ত্তৃত্ব, যন্ত্রকৌশল, বিজ্ঞান দৃষ্টি, পার্থিব হিত। টান্‌ছিল তাকে
পরপারে অতিমর্ত্ত্য পুণ্য, জাগ্রত করুণা, চির নবীন কলেবর, অক্ষয়
আবার উদ্বেগ-ভাবনাশূন্য স্বাস্থ্য-সুষমা-সামঞ্জস্যের প্রতি, নীতিহীন দ্বি
কৃত্রিমতাহীন যৌবনের প্রতি, মানবজাতির স্বর্ণাভ অতীতের প্রতিও তার
ছিল। ফাউষ্টের তিন দিকে তিন আকর্ষণ—সয়তান, গ্রেচেন, হেলে
তিন জনকেই স্বীকার করে তিনজনের সঙ্গে তিনরকম বোঝাপড়া
দরকার ছিল।

সয়তান যদি হয় সংশয়ের প্রতিরূপক, গ্রেচেন যদি হয় ক্রিশ্চিয়ানি
তবে হেলেনা হচ্ছে মানবসৌন্দর্য্যের। আজো ইউরোপের ধ্যানে হেলে
রূপই চিরন্তনী সুন্দরীর রূপ। ভারতবর্ষে তার তুলনীয় নেই। আমা
রূপের আদর্শ অপ্সরাতে বা দেবীতে নিবদ্ধ রয়েছে, মানবীতে রক্তমাংস পরি
করেনি। হেলেনার কথায় একমাত্র শ্রীরাধার কথাই মনে আসে,
শ্রীরাধাতে প্রমূর্ত্ত হয়েছে আমাদের প্রেমের আদর্শ—যার তুলনীয় ইউরো
নেই।

মধ্যযুগের মানব হেলেনাকে উপেক্ষা করে জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণ ক
পারত না। যারা হেলেনার আহ্বান শুন্‌ত তাদের ইহকাল-পরকাল
আর যারা শুন্‌ত না তারা ছিল অবিদগ্ধ, অনাগরিক। ফাউষ্ট হেলে
সঙ্গে মিলিত হল অথচ সেই মিলনে ভ্রমরের মত পদ্মসমাধি পেল
হেলেনাকে অতিক্রম করে গেল। সৌন্দর্য্য ও সন্ধিৎসা সঙ্গত হয়ে যার
দিল সে কথা শোনে না, শূন্যে লাফ দিতে দিতে ছুটে চলে, সে চায় সা
সে চায় যশ। প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান
আধুনিকতা। তার কপালে আছে অপঘাত। কিন্তু কি বিমোহন তার তা

"ফাউষ্টে"র নিত্যকালীন ব্যাখ্যা তাকে জাতিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমা
করেছে। সে আমাদেরও।

১৬৪০]

মানুষের মধ্যে যে বহির্ম্মুখীনতা আছে তাকে কেউ বলেছে সয়তান, কেউ বলেছে মার, কেউ বলেছে রিপু। তার সঙ্গে মানুষের যেন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। তাকে দমন করা, তার উপর জয়ী হওয়া, এই যেন মানুষের সাধনা। এই সাধনার মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, একে অবলম্বন করলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে একাসনে বসে রইতে হয়, প্রকৃতির রূপ গন্ধ গান হয় নিস্ফল নিরর্থক। এ সাধনায় সিদ্ধি যদি বা আসে তবে যেন pyrrhic victory, তাতে প্রাপ্তির ভাগ ক্ষুদ্র।

এ ছাড়া অন্য এক সাধনা যে সম্ভব তা আমাদের জানা ছিল না। এতে পাপেরও স্থান আছে প্রলোভনেরও মূল্য আছে, সয়তানকে এ সাধনা শত্রু বলে না। কারুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই, কারুর উপর জয় নেই, সকলে সহায়। সৌন্দর্য্যকে সম্ভোগ করতে হয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়, প্রবৃত্ত হতে হয় নব নব অসাধ্যসাধনে। এই সাধনার মন্ত্র—এক এক করে ছাড়িয়ে চল, আটকে থেক না। মানবাত্মার আসক্তি সাজে না, বিশ্রাম নেই, আরাম ভয়াবহ। ভোগ কর, কিন্তু ভোগের পরক্ষণে ত্যাগ কর। ত্যাগের বেদনাকে এড়াতে চেয়ো না। ভালও যথেষ্ট ভাল নয়। ভালও আজ বাদে কাল ভাল নয়। ভাল মন্দ দুইই নিতে হবে, ছাড়তে হবে। পাপ কর, কিন্তু পাপে জড়িয়ে যেয়ো না। প্রলোভনের অনুবর্ত্তন কর, কিন্তু অধীন হোয়ো না। এইভাবে চরিত্র পাক্ পূর্ণতা, চরিত্রবলের দ্বারা অক্ষত থাক। জীবন বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক, উপলব্ধিতে আসুক সমৃদ্ধি, সত্যের সঙ্গে পরিচয় হোক সত্যতর।

মানুষ যদি কোনোখানে বাধা না পড়ে, ক্ষান্তি না দেয়, তবে প্রকৃতির নিয়মে তার মৃত্যু হলেও মৃত্যুতে তার বিরতি নেই। তার চলা এবার মর্ত্ত্যে নয়, অতিমর্ত্ত্য লোকে। এবার তার সাথী সয়তান নয়, শাশ্বতী। এই বিশ্বের অন্তর্লোকবাসিনী যে নারী মর্ত্ত্যলোকে মানবের সঙ্গিনী হতে পারল না, মর্ত্ত্যে যার পরিসর সঙ্কীর্ণ বলে অসীমের অভিসারক যাকে পরিত্যাগ করল, স্বর্গে সেই নারী ভাগবত করুণাবাহিনী, তারই নিত্য প্রার্থনা ভাগবত করুণাকে আবাহন করে আন্‌ল, গঙ্গোদকের মত মানবের শীর্ষে ছিটিয়ে দিল, শান্তর-ধরল দিব্য কলেবর। একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়ে সে করেছে আপনাকে

নিস্পৃহ, সে রেখেছে মুহূর্ত্তের প্রেমকে চিরন্তন করে, তার তপস্যা প্রিয়তমকে ঘিরে। সেই কল্যাণরূপিনী যদি প্রদর্শক না হয় তবে মানব যে মানব অভিজ্ঞতার চরমে গিয়ে—মৃত্যুতে উপনীত হয়ে—অমৃতের দাঁড়িয়ে থাকবে, পায়চারি করতে থাকবে, প্রবেশ পাবে না। নারী তা ছাড়পত্র এনে দেয়, ভিতরে নিয়ে যায়, উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর লোকে ক্রমাগত নি চলে। সেই নিরুদ্দেশ উর্দ্ধ যাত্রাই নিরন্তর স্বর্গভোগ। সে ভোগ না সমন্বিত।

পরম সঙ্গিনীর প্রশস্তিতে Goethe-র ফাউষ্ট সমাপ্ত হল। বৈকুণ্ঠ, কাল চিরকাল। প্রশস্তিকারকরা স্বর্গীয় চারণ।

All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love,
The Eternal-Womanly
Draws us above. *

লীলাময় রায়

* A. G. Latham-এর অনুবাদ। (Everyman's)

এই জীবন

যখন করোনার সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে রায় দিলেন, 'সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন', তখন খগেনবাবু সব কথা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন ব'লে মনে হ'ল না। সাহেব চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন, কিন্তু খগেনবাবু চেয়ারে বসেই রয়েছেন দেখে উকীল বাবু তাঁর জামা ধ'রে টান দিলেন। তাই খগেনবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে গেল, 'মহাশয়, ধন্যবাদ'। সাহেব দুঃখ জানিয়ে চলে যাবার পর উকীল মহাশয় তাঁকে বাইরে এনে ট্যাক্সীতে তুলে দিলেন। গাড়ি ছাড়বার পূর্ব্বে তিনি খগেনবাবুকে তাঁর একটি ছোট্ট কর্ত্তব্যের কথা লজ্জার সহিত স্মরণ করাতে বাধ্য হলেন। পকেট থেকে একখানি নোট বার ক'রে তাঁকে দেওয়াতে তিনি বললেন, 'চিরকাল আদর্শ নিয়ে থাকলে চলে না, খগেনবাবু, আমরাও যুবা-বয়সে ঐ রকমই ছিলাম; কি আর বলব, তবে যদি কখনও উপকারে আসি, সত্যি কৃতজ্ঞ হব। ভুলবেন না, আমি ঐ কোণের চেয়ারেই বসি, লোকে যে যাই বলুকগে, আপনি তোয়াক্কা করবেন না। আমি অন্ততঃ আপনাকে বুঝেছি, আমি উকীল, পুলিশকোর্টে দশ বছর ঘুরছি, মানুষ চিনতে আর বাকী নেই। মেয়েমানুষ হিংসেতে সব করতে পারে, কেবল ছেলের মা হতে পারে না, এই দেখুন না, পাঁচটি মেয়ে। হাঁ, এই নিন রায়টা, নচেৎ মড়া ছাড়বে না।' গাড়ী ছুটল মেডিকেল কলেজের দিকে।

বউবাজার ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর কোণে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে দিলে, এঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দ হতে লাগল। পাশেই একটি রিকশ'র ওপর একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক বসেছিলেন। পায়ের কাছে একটা মস্ত মোট, খুব বড় সতরঞ্চি হবে। রিকশওয়ালা হাঁফাচ্ছে। সারি বন্দী গাড়ি গড়ের মাঠের দিকে ছোটবার জন্য তৈরী। দেরী দেখে রিকশ'র ভদ্রলোক আলাপ জমাতে লাগলেন, 'এই যে খগেনবাবু! আজ খেলা দেখতে যাবেন না? আমি যাব না, কেবল ভিড় খাও, আর পয়সা খরচ কর। ট্যাক্সীতে বসে

সিগারেট খাবেন না।' খগেনবাবু সিগারেটটা উলটে পাঁচ আঙুল
ঢেকে রাখলেন। ফাঁক দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, হাতটা ট্যাক্‌
বাইরে রাখলেন। কোথায় যেন এঁকে দেখেছেন মনে হল। হাঁ হাঁ
পড়েছে—ভদ্রলোক বিবাহাদি শুভকার্য্যে বাড়ী সাজান, তাঁর শ্বশুরবা
পরিচিত, তাঁরই বিবাহে প্যাণ্ডাল সাজিয়েছিলেন, বিবাহের পূর্ব্ব
সামিয়ানা পুড়ে যায়, পরের দিন নতুন আসরের কোণে গোটাকয়েক পে
বাঁশ জড় করা ছিল মনে আছে। ভদ্রলোকের অত টাকা লোক্‌সান হওয়া
পরে মাথা খারাপ হয়েছিল, বিকারের খেয়ালে আগুন আগুন করে চেঁচা
নাকি। পুলিশম্যান বাঁশী বাজালে, ট্যাক্‌সীর মিটারে বার আনা উঠো
গাড়ি বেঁকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে এল। তাঁরও মাথা খারাপ হবে না
না, তাঁর কেন হবে? তিনি তিলমাত্র দোষ করেন নি। সাবিত্রীর স্ব
ছিল তাই—সন্দেহ, আর সন্দেহ। এধারে ভালমানুষ ছিল, বিয়ে
কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত ত কোন গোলমাল করে নি, তারপর, তার
কোথা থেকে তার বন্ধুর দল জুটল, সব শিক্ষিতা। মাসীমা ঠিক্‌ই বলতে
'শিক্ষার মুখে ছাই, শিক্ষার দ্বারা ভালবাসতে শেখে না, ভালবাসাতে
তিনি অল্প কথায় অমনি জ্ঞানের কথা কইতেন। তাঁর ঐ অপবাদ।
কিনা তাঁর বোনপোর সব দোষ ঢাকতেন, যার ওপর তার মন পড়েছে
আদর করে বাড়ীতে আনতেন, নিজের বাড়ীর বৌএর ওপর জাতে
কারণ কি? আর 'বোনপো ...র দেওরঝির সঙ্গে বিয়ে দিতে পা
দু'দিক থেকেই সুবিধা হত, সেটা হয় নি।' ছিঃ ছিঃ—মাসীমার কেবল
ছিল, ছেলেকে পশুর মতন ভালবাসা, অন্ধ স্নেহ। তাঁর উচ্চশিক্ষা ছিল
ছিল হৃদয়। হৃদয়ের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল, সেই জন্য তিনি কেবল
বাসতেই জানতেন, প্রথমে ছেলেকে, ছেলে বই বোনপো কখনও ভারেন
তার পর ছেলের বৌকে। নিজের প্রতি কোন মায়াই তাঁর ছিল
সেই মাসীমাকে বিয়ের অল্পদিনের পরই কাশীবাসী হতে হল। ও
স্ত্রীলোক কখনও নিজকে ভালবাসার সামগ্রী করে তোলে না, নানা
মনোহারী সাজসজ্জার দ্বারা। আর সাবিত্রীর বন্ধুরা, রমলা দেবী, সাবি
দামী সাড়ি, সেঁটে পরা, হাতকাটা ব্লাউস, ঢিলে খোঁপা, চোখে সুর্ম্মা,

নাগ্‌রা, তাদের হৃদয় কোথায়? হৃদয় হয়ত আছে, তবে হিংসায় পোরা, মাৎসর্য্যে ভর্ত্তি। এ শিক্ষার মুখে ছাই!

ট্যাক্‌সী মর্গের সামনে এল। ভাড়া চুকিয়ে খগেনবাবু নেমে পড়লেন। অঙ্গনে দুটি পাহারাওয়ালা, আর অনেকগুলি মোটর রয়েছে। ...দের কি একই দশা? নিশ্চয়ই ডাক্তারদের। একটি তার মধ্যে পরিচিত গাড়ি, শেভ্রলেট নতুন মডেলের। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ ধরণের গাড়ি কিনলেন আশানাথবাবু, স্ত্রী রমলা দেবীর জন্য, সেই গাড়ি চড়ে সাবিত্রী সারা কোলকাতা ঘুরে এলেন, আশানাথবাবু এখনও চড়েন নি বোধহয়, কিনে দিয়েই কর্ত্তব্যে তাঁর ছুটি হয়ে গিয়েছিল। নতুন গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে ফেরবার পর খগেনবাবু দেখেছিলেন তাঁর স্ত্রীর চোখে সুর্‌মা, গালে ও ঠোঁটে রং, পরণে লাল ডগ্‌ডগে সাড়ি, সাড়িটা নিশ্চয়ই রমলা দেবীর। খগেনবাবু ঘোর রং পছন্দ করতেন না, এবং ঐ রকম সাজসজ্জার উগ্রতা তাঁকে পীড়া দিত। পত্নীবন্ধুর অনুকরণে তাঁর স্ত্রীর রুচিবিকার ঘটছে দেখে তিনি বরাবরই প্রতিবাদ করতেন, ফল হত না। এবার প্রতিবাদ করেছিলেন ...লের সমক্ষে। উত্তর পেয়েছিলেন, 'তোমরা যখন মাছরাঙ্গা পাখী সেজে টেনিস খেলতে যাও, তার বেলা?' খগেনবাবু উত্তর করেছিলেন, 'কৈ, আমার প্লেজার নেই ত?' সাবিত্রীর বদলে রমলা দেবীই উত্তর করেছিলেন, 'আপনার নেই বটে, কিন্তু আপনাদের ...কে, আপনি মিশুক নন্‌, নিজের কাজ নিয়েই থাকেন, আপনভোলা। ...রা সমাজে মেশে তাদের প্লেজার থাকে। আপনি নিজের সম্বন্ধে কেয়ারলেস্‌ বলে সাবিত্রীও তাই হবে? আপনি সত্যই সাবিত্রীকে ভালবাসেন, নিজের মতো ক'রে গড়তে চান, নয় কি?' খগেনবাবুর মনে একটা প্রশ্ন উঠছিল, নিজে তা হলে চাপা রং ব্যবহার করেন কেন? কিন্তু রমলা দেবীর হাসিমুখের সাংঘাতিক প্রশ্নকে ঠাট্টা ভেবে চুপ করে রইলেন, সাবিত্রীর ইঙ্গিতে হাসিমুখে বাড়ীতে পদার্পণ করতে অনুরোধ করেছিলেন, রমলা দেবী আসেন নি, গাড়ির দরজা নিজে খুলে দিতে হয়েছিল, সাবিত্রীর চোখের তাড়নায়। আজ রমলা দেবী এসেছেন মৃতবন্ধুর দেহের প্রতি শেষ সম্মান জ্ঞাপন করতে, খৃষ্টান হলে যেমন মালা নিয়ে যেতেন গোরস্থানে। এ দুদিন খুবই করেছেন, কিন্তু আজ এখানে

ধাওয়া করা উচিত হয় নি নিশ্চয়ই। সাবিত্রীর সঙ্গে, খগেনবাবুর [illegible] কথা কইবার প্রয়োজন ছিল। আজ তিনি অনেক প্রাণের কথা কইবে[illegible] মনে মনে তার সঙ্গে, এই ভেবেছিলেন, কিন্তু গাড়ি দেখেই তাঁর মন [illegible] আপনা থেকেই বিমর্ষ হয়ে গেল। আজ ওদের আসবার দরকার ছিল [illegible] আসাটা অশোভন হয়েছে। সাবিত্রীর বন্ধু স্বামীস্ত্রীর মধ্যে [illegible] সৃষ্টি করেছিল আজও কি তাকে অপসৃত করবার সুযোগ মিলবে না। [illegible] অদ্ভুত মর্‌বিড্ রুচি এই মহিলাটির! পরের উপকার ইনি করবেনই করবে[illegible] রোজ না পরের উন্নতি করলে রাতে ঘুম হয় না, নিশ্চয়ই এঁর ঘরে বিবেকা[illegible] নন্দের ছবি, আর টেবিলে মহাত্মাজীর দেহের ওপর অস্ত্রোপচারের চীনে মাটি[illegible] মডেল আছে, আশানাথবাবুও ধারে কোথায় কি করেছেন কে জানে? [illegible] যে রমলা দেবী নার্স কি লেডী ডাক্তার হলেন না ভগবানই জানেন! আ[illegible] খুললেও পারতেন, বিবাহিতের সংসারে শান্তি বিরাজ করত!

মর্গের মধ্যে কন্‌কনে হাওয়া। চার ধারে কাচের আলমারী, সর্ব[illegible] সাদা পাথরের টেবিল, একটার চার পাশে ডাক্তার ও ছাত্রের দল, সাদা ওভার[illegible] অলপরা, ডাক্তারের হাতে সাদা রবারের দস্তানা, ছাত্রদের মুখে ব্যস্ত[illegible] অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য, সব মুখ বুজে কাজ করছে, কাজ আর কি! ডাক্তার সাহেব পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, খগেনবাবুকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন। করোনারের রায় দেখাতে ডাক্তার সাহেব অ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে বল্লেন, 'মল্লিক, পাঁচ নম্বরের লাস খালাস হ'ল, ছেলেদের তা হলে ছুটি, আবার এ[illegible] দেখা যাবে।' ডাক্তার সাহেব ঘড়ির দিকে চেয়ে দ্রুত পদে বেড়িয়ে গেলেন। পাশের একটা গা-আলমারী থেকে ডালা বেরিয়ে এল, পা দুটো একদম হল[illegible] বাকী অঙ্গ ঢাকা, পায়ে সেই ছেলেবয়সে গরম দুধ পড়ে যাওয়ার দাগ। এ[illegible] জন সিনীয়র ছাত্র এগিয়ে এসে বল্লেন, 'লোকজন এনেছেন ত' না আমাদে[illegible] দলকে খবর দেবো, পাঁচটাকা ক্লাবে চাঁদা দিলেই হবে।' পিছন থেকে এক[illegible] মহিলা — রমলা দেবী — সব সাদার মধ্যে রং-এর শিখা — সাবিত্রীর ব[illegible] এগিয়ে এসে বল্লেন, 'খগেনবাবু ওটুকু আর হতে দেবেন না, আত্মীয়[illegible] ডাকুন্‌গে—যান,—না হয়, আমার গাড়িটাই নিয়ে যান—ড্রাইভারকে ত[illegible] ত চেনেন—আচ্ছা চলুন আমিই না হয় যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।' 'না আ[illegible]

নাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি একলাই নিয়ে আসছি।' 'সে কি হয়! আপনি পারবেন না, আমারও কর্ত্তব্য আছে, আপনাকে এ অবস্থায় একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।' 'কোন ভয় নেই আমার সম্বন্ধে' 'লোকজন কোথায় পাবেন?' 'লোকজন, আচ্ছা, ক'জন চাই, আমার সব বন্ধুরা আছেন [illegible]—' 'তাদের খবর দিয়ে আজ কাজ নেই, খবর তারা পরে পেলেই হবে; আজকের দিনটা না হয় আমার কথা শুনুন, চিরজীবনই স্বাধীন থাকবেন, আর কখনও আপনাকে বিরক্ত করবনা।' রমলা দেবীর চোখের কোণে জল দেখে খগেনবাবু আর আপত্তি করলেন্ না—লোকই বা তিনি কোথায় পাবেন? বাইরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন, সামনের সীটে নয় একেবারে রমলা দেবীর পাশে। কি রকম অস্বস্তি হচ্ছিল, অথচ মজার, পরিহাসের। তিনি মোটরে তাঁর এক বন্ধুপত্নীর পাশে বসে তাঁকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যান, লোকে দেখতে পায়, সঙ্গে কেউ ছিলনা, তাইতে কত না গণ্ডগোল হ'ল; এই রমলা দেবীর এক মহাবচন উদ্ধৃত করে সাবিত্রী তাঁকে তর্কে পরাস্ত করে, 'কৈ কোন্ সমাজে কোন্ পুরুষ অন্যের স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর অবর্ত্তমানে পাশে বসিয়ে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যায়?' খগেনবাবু বিলেৎ-ফেরৎ ছিলেন না, হিন্দুঘরের সন্তান, বড় ঘরে মেশেন নি তাই তাঁর মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। রমলা দেবী উচ্চ শিক্ষিতা, বিলেৎ-ফেরৎ সমাজের কন্যা না হ'লেও সেই সমাজের মহিলা, আধুনিক ইংরিজি সাহিত্য-পড়া, ডিকেন্স, থ্যাকারে. চার্লস রীডের ভক্ত, লুকিয়ে লেডী চ্যাটার্লির 'লাভার'ও পড়েছিলেন, খগেনবাবু প্রমাণ পেয়েছিলেন। আজ সেই রমলা দেবীর পাশে বসে চলেছেন, তবে থিয়েটার দেখতে নয়, শবযাত্রার যোগাড় করতে। আনন্দোপভোগের নিয়ম থেকে নিরানন্দের উপকরণটা অন্ততঃ ভিন্ন হবেই হবে, তবে ঐ যা সাবিত্রীর দেহটা এখনও নিঃশেষিত হয়নি। গাড়ির এক কোণে আলগোছে খগেনবাবু বসে রইলেন, তাঁর দৃষ্টি রাস্তার দিকে। পূর্ব্ববঙ্গীয়দের জামা কাপড়ের দোকান অতিক্রম করে গাড়ি মির্জ্জাপুরের এক গলিতে প্রবেশ করলো, মোড়ের মাথায় একটি গান্ধিটুপি পরা ছেলে আনন্দবাজার বিক্রী করছিল, খগেনবাবুর কেনবার ইচ্ছা থাকলেও সাহস হলনা, পাছে নিজের খবর নিজেকে পড়তে হয়। রমলা দেবী এক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ

করলেন, খগেনবাবু আর নামলেন না। রমলা দেবীর ফিরতে দেরী দেখে তিনি মোড়ের উপর এক চায়ের দোকানে এক কাপ চা তৈয়ারী করতে অর্ডার দিলেন। পাছে চা'র নেশা রমলা দেবীর বিসদৃশ ঠেকে এই লজ্জায় ডিসে ঢেলে অল্প সময়ের মধ্যেই চা পান করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'তেই জন কয়েক সুদর্শন যুবক নেটের গেঞ্জী পরে, কাঁধে টার্কিশ তোয়ালে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীর মেয়ে খাওয়ানোর তেতালার ছাদের কোণে কর্ম্মের অপেক্ষায় যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। রমলা একজনকে সম্বোধন করে বললেন, 'আচ্ছা বিমল, বিজন সুজনদের দিলে কেমন হয়?' 'আগেই খবর পাঠানো হয়েছে, তারা খাট আসছে।' রমলা দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনিই — — —, বাবু, আমি আর যাবনা, এরাই যাবে, খগেনবাবুর শরীরটা খারাপ, তোমরা ওঁকে নিয়ে এখানেই এসো।'

গাড়িতে চারজন যুবক উঠ্‌লেন, ছাড়বার সময় রমলা দেবী ছেলের হাতে কি একটা গুঁজে দিলেন, বাকি কয়জন হেঁটে চললেন। ক্ষণের মধ্যেই মর্গের দরজায় গাড়ি এল, সকলে নামলেন। খগেনবাবু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশের হুকুম পাওয়া গিয়েছে, আপনা বা'র করুন না?' 'আগে খাট আসুক।' 'ততক্ষণ?' 'ততক্ষণ কি করবেন, চলুন, কলেজের রেস্তরেন্টে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, আপ কিছু খেয়ে নিন, ভাল খাবার দেয়, ভেজাল দেবার যো নেই, এটা মেডি কলেজ, বেলগেছেও নয় বাজারও নয়।' খগেনবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল 'বেশতো, বেশতো, চলুন না।' বলেই কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখ কিছু নেই। তাঁর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে একজন বললেন, 'আচ্ছা আ থাকুন, আপনার শরীর খারাপ, আমরা আস্‌ছি।' 'এ ছেড়ে যাওয়া উ নয়' বলে খগেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

যুবকবৃন্দ চলে গেলে খগেনবাবু আজ এই প্রথম একলা একলা তিনি মনে মনে বহুদিনই হ'য়েছিলেন। হয়তো, জন্মে ভীষণ একলা হ'য়ে, যমজ-আত্মার একটি হ'য়ে নয়। মনে কেউ

হয়না, দেহে-ই হয়। কবিরা কি ভীষণ মিথ্যা কথাই না লিখতে পারেন? সেই মিথ্যা কথার জন্য কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে যদি তাঁরা জানতেন তা হলে, তা হলে তাঁরা … কি লেখা ছেড়ে দিতেন? কখনই নয়। তাঁরা অত্যন্ত অসামাজিক জীব, সমাজের কল্যাণ-কামনায় তাঁরা ব্যস্ত নন, অথচ সুখ্যাতিটুকু চাই। মানুষ হ'ল একলা, সে সজারুর মতন থাকে গর্ত্তের মধ্যে, গর্ত্তের মুখে কত পাতা, কত কুটো দিয়ে নানারকমের বাধা সৃষ্টি করছে পাছে শত্রু আক্রমণ করে। গর্ত্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করলো, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো, ঐ বুঝি এল! এক নিঝুম গোধূলিতে সে বেরিয়ে পড়লো খাদ্যের অনুসন্ধানে, বাইরে এসে তা'র পা আর চলে না, গর্ত্তের মুখের কাছে এসে আর এগোতে চায়না, ছুটোছুটি করে; কোথা থেকে ঝমর্ ঝমর্ শব্দ আসছে! আবার ভেতরে যাওয়া ও বাইরে আসা। ওধারে ক্ষুধার তাড়না। সেই বাইরে আসতেই হয়, সেই ঝমর্ ঝমর্ শব্দ সারা দেহ বেষ্টন করে বাজ্‌তে থাকে, বাগানের কাঁটা বেড়ার কোন এক ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে, মূল উপড়ে খেতেই হয়। কপাল গুণে ফিরে আসে আবার নিজ আবাসে, সেখানে সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্তরীণ-বাস; কপাল দোষে আর ফিরে আসতে হয় না, বাগানের মালী কলার তেড় ছুঁড়ে তাকে মারে, কাঁটা গুটিয়ে নেবার পূর্ব্বেই আটকে যায়, তখন—তখন আবার সেই অন্ধকার! এই ত প্রকৃতির নিয়ম, এই ত জীবন! মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষের প্রকৃতিও তাই, পার্থক্য শুধু মিথ্যা আবরণের আবডালে ভীতি গোপন, পার্থক্য শুধু মালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের আত্ম-প্রবঞ্চনা, পার্থক্য কেবল কাঁটার উপর সামাজিকতার আভরণ। মাতৃগর্ভে অন্ধকার, কবরের মধ্যে অন্ধকার; মানুষে সীতার সন্তান, সীতাই হলেন আদিম মানবমাতা। অথচ এই অন্ধকারের মধ্যে এক সহযাত্রী জুটল। নিজেই পথ পায়না আবার পথ দেখাতে হবে অন্যকে; সে আবার অন্য পথ খুঁজতে ব্যগ্র নয়, মাত্র, কেবল, নিছক নির্ভরশীলা অর্থাৎ পথের কণ্টক। নিজেই এই গুহার মধ্যে ভয়েতে কাঁপছে, প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত হচ্ছে, তার উপর এই গুহাবাসিনী অন্ধকার-ধর্ম্মিণীর আত্মার কল্যাণ-কামনা করা, তাকে অভয় দেওয়া। আপনি খেতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাক। তাও ডাকা যেত

যদি তার অস্তিত্বে, উপস্থিতিতে ভয় দূর হত। মানুষ নিজেকে নিয়েই
সে আবার পরের ভাবনা ভাববে! ভয় দূর করতেই সে গুহার গায়ে
আঁকছে, দুরন্ত প্রকৃতির পরিতোষ বিধান করছে, তার সমগ্র শক্তি নিয়ো
করছে, সে আবার পরকে সাজাতে, তার তৃপ্তি সাধন করতে কতটুকু পারে
পারেনা, শক্তির সীমা আছে সেই জন্যই পারেনা; আর নিন্দে হয়; নি
হয় রমলা দেবীর মতন পত্নীর বন্ধুদের কাছে, যাঁরা আত্মসন্ধানী নন।
থাকেন গুহার বাহিরে, গাছের ডালপালায় অন্যান্য সামাজিক জীবজন্তুর ম
কিংবা থাকেন গাছের ফলের মধ্যে রসশোষণ করবার জন্য, ভেতরটা ভুয়ো ক
দেবার জন্য, কিংবা যাঁরা পরাগ ছড়াবার জন্য ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়া
এঁদের দৃষ্টান্তে, এঁদের উপদেশেই সাবিত্রী গুটি-কেটে প্রজাপতি হয়েছিলে
তাইত এই অঘটন ঘটল। সাবিত্রী স্বধর্ম্মেই যদি আত্মনিধন করতেন, তা হ
খগেনবাবুর আপত্তি ছিলনা। পিন্-এ আটকানো মরা প্রজাপতি হওয়ার চে
মরা গুটি হয়ে রেশমের যোগান দেওয়া ঢের বেশী সামাজিক কাজ।

খাট এল, শব নামান হল। খগেনবাবুকে শবের কপালে সিঁ
পরাতে হল। মুখটা নীল, পা হলদে, পায়ের শিরগুলো নীল হয়ে ফু
বেরিয়েছে। কী ঠাণ্ডা! এক বিগৎ ওপর থেকেই ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে
বিমল নিজেই পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দিলে। কোথা থেকে এরা সব শিখলে
পরনে সেই রঙ্গীন শাড়িটা। উল্টো মুখ করে খাটে চড়ানো হল। এক
ছেলে গায়ের উপর খদ্দরের চাদর বিছিয়ে দিলে। যেন ভৌতিক ক্রীড়া
মতন সব আপনা থেকেই, হয়ে যাচ্ছিল। রমলা দেবীর আত্মীয়-স্বজনে
তাঁরই মত কর্ম্মতৎপর। খাটটা কাঁধে তোলবার সময় মুণ্ডটা নড়্‌নড়্ ক
উঠ্‌ল। একজন বাহক বলে উঠলেন, 'দোহাই মা, জেগে উঠবেন না
অগ্রবর্ত্তী বাহকদের মধ্যে যিনি বামস্কন্ধ দিয়েছিলেন তিনি বলে উঠলেন
'কি ইয়ারকী করছিস! একটিন সিগ্‌রেট্ নে, হরি বোল বলতে পে
জানিসত?' খগেনবাবু কাঁধ দেননি, তাই তাড়াতাড়ি দোকান থে
একটিন সিগারেট কিনতে গেলেন। কি রকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। তাঁ
গুলাটা বন্ধ হয়ে আসছিল, রসিকতা না করলেই চলত! হরিবোলে আপ
কি? হরিবোলের আওয়াজটাও যে মধুর তাও নয়, শুনলে ছেলেবেলা থে

মুড়ি দিতেন, বড় হবার সঙ্গে সে ভয়টা যায়নি, কেবল মনে হত নীচু জাতেই হরিনাম করে, নামকীর্ত্তন করে, ভদ্রলোকে হয় শাক্ত, না হয় বৈদান্তিক, না হয় ব্রাহ্ম, কিংবা অবিশ্বাসী। কিন্তু এ যেন মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে! যারা আত্মহত্যা করে তারা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা, আর সেই জন্যই কি ঈশ্বর-বিশ্বাসী শববাহীরা তাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে না? নেটের গেঞ্জী, কাঁধে তোয়ালে, মাথায় চুলের পশ্চাদা-ভিমুখিনতা লক্ষ্য করলে মনে ত হয় না যে এঁরা সকলেই ভগবানে বিশ্বাসী। এ যুগে কে-ই বা বিশ্বাসী? বিশ্বাসী কেউ হতে পারে না। বিশ্বাস বড় বোঝা। কাঁধ কি তাঁকে দিতেই হবে? না দিলে খারাপ দেখায়; দায় তাঁর, এদের নয়। না দিলে রমলা দেবী হয়ত কিছু মনে করতে পারেন। জীবিত অবস্থায় স্ত্রী বহন, আবার মৃতা স্ত্রীর শববাহন, দুই কাজই কি রমলা দেবীর ইচ্ছায় করতে হবে? খগেনবাবু সিগারেট্ টিন কিনে ও খুলে দ্রুতপায়ে শবযাত্রীর নাগাল ধরলেন। চিত্তরঞ্জন আভিনিউ দিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কর্ত্তব্যবোধে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন, কাঁধ দিলেন, কিন্তু পাঁচমিনিটেই গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, কাঁধে ব্যথা উঠল, খাটটা ক্যাঁচ্-কোঁচ্ করছিল, ভয় হল এইবার বুঝি তাঁরই দোষে পড়ে যাবে। কাতরভাবে চাইতেই একজন যুবক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, মুখে যেন একটু হাসি লেগে রয়েছে। খগেনবাবু যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। রাস্তার আগুনে পা পুড়ে যাচ্ছিল, রাস্তার এক কলে হাত পা ও মুখ ধুলেন। বীডনষ্ট্রীট দিয়ে, চিৎপুর পার হয়ে নিমতলায় পড়লেন। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে কি একটা আছে, ডাক্তারদের বাড়ি থেকে আরম্ভ করে কাঠের দোকান, মালসার দোকান পর্য্যন্ত সবই আছে এখানে, প্রত্যেক জিনিষটাই যেন শেষ মুহূর্ত্তকে এগিয়ে আনছে। এ রাস্তায় বুড়োবুড়ি ভিন্ন অন্যলোক সহজে চোখে পড়েনা, বাকি সব হিন্দুস্থানী, মুস্‌কো মুস্‌কো, দুষ্মনের মতন চেহারা, বোধহয় 'চ্যারণে'র বংশধর মাঝিমাল্লা না হয়ে চিতের চালাকাঠ কাটে।

নিমতলার ঘাটেও কিসের ব্যস্ততা। আলো সতেজে জ্বলছে। খাট নামিয়ে দলের মধ্যে নীরব ব্যক্তিটি কনস্টেবলের সঙ্গে ঘাটের অফিসের দিকে গেলেন, খগেনবাবুর কাছ থেকে করোনারের রায়টি চেয়ে নিয়ে। অন্যান্য

যুবকেরা খাট ছুঁয়ে খগেনবাবুকে বসে থাকতে অনুরোধ করে এক
ক'রে অদৃশ্য হলেন। শবের মুখে পাংশুতা ভেদ ক'রে যে কমনীয়তা
উঠেছে সেটি লক্ষ্য করবার সামগ্রী। মুখের এই কোমলতা সাবিত্রীর প্র
আকর্ষণ ছিল, এই শান্ত ও গম্ভীর মাধুরিমায় সকলে মুগ্ধ হ'তেন। ত্র
বল্‌তেন, 'কি মিষ্টি,' গিন্নীরা বলতেন, 'কচি', পুরুষেরা বলতেন, 'কি লাব
খগেনবাবু একে একদিন বলেছিলেন, 'মুখোস'। ব্যক্তিত্বটাই হল এ
অদৃশ্য মুখোস। খগেনবাবুর খরদৃষ্টিতে সাবিত্রীর যে প্রকৃতিটা ধরা পড়ে
সেটি রূপে বিশুদ্ধ লাবণ্যময়ী ছিলনা; তার ধাত ছিল খানিকটা
লোহা, খানিকটা সাধারণের সন্তোষবিধানের জন্য প্রচেষ্টার খাদ, এ
সে রূপের ওপর পড়েছিল অন্যের প্রকৃতির ছাপ ও অনুকরণ। মুখ
মধ্যে একটা ভয়ের চিহ্নও থাকত, সেটাকে দেখেই সাবিত্রী
'বনের হরিণ' কবে কে একবার বলেছিল, সাবিত্রীর মুখে তিনি শুনেছিলেন
আজ সেটা পরিস্ফুট হয়েছে! কিসের ভয়? হরিণের, আদুরে পো
খরগোসের সন্দিগ্ধচিত্ততার, না মৃত্যুর মতন সত্যের সামনাসামনি দাঁড়াবার
হাতের চুড়িটা ঢল্ ঢলে হয়েছে, গলার হারটা উলটে গিয়েছে। খগেনবা
ধীরে ধীরে হারটা গুছিয়ে সোজা করে দিলেন। এই হারটা নিয়ে একবা
কতদীর্ঘ অভিমানের পালা হয় তাদের মধ্যে! সাবিত্রী বলেছিলেন
'আমি হার পরলে সকলে বলে ভারী সুন্দর দেখায়, তুমি ত আমাকে মু
ফুটে একবারও ভাল দেখাচ্ছে বলনা?' খগেনবাবু উত্তর করেন, 'তোমাকে
না পরেই ভাল দেখায় কি না, তাই বলিনা।' সাবিত্রী রাগ করে হার
গলা থেকে টেনে খুলে ফেলেন, আট্‌কাবার পিন্‌টা খারাপ হয়ে যায়, খগেন
বাবু সারিয়ে দেবার জন্য স্যাকরা ডাকেন। স্যাকরা এলে শোনেন, গহনা
রমলা দেবী নিজের আশ্রিত অন্য এক স্যাকরার দোকানে আগেই নিয়ে
দিয়ে এসেছেন। খগেনবাবুর একটু অভিমান হয়; সে অভিমান প্রকাশে
উত্তরে সাবিত্রীর মুখ থেকে এক অদ্ভুত জবাব পান, 'তুমি পরের বৌএর
গহনা ভেঙ্গে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, আমার জন্য তোমার কোন কষ্ট
করতে হবে না।' খগেনবাবুর এক বন্ধুর স্ত্রীর কোন এক গহনা খারা
হয়ে যায়, তিনি সেটাকে স্যাকরা বাড়ি দিয়ে এসেছিলেন, সে অবশ্য রমলা

দেবীরই আশ্রিত দোকানী-টি। কথা বেশ হেঁটে বেড়ায়! ঘটনাটি মনে
পড়তেই খগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশেই একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
তাঁদের দেখছে। খগেনবাবু সাবিত্রীর মুখ আড়াল করে দাঁড়ালেন। আচ্ছা
ভদ্রলোক ত'! ঠোঁট ভীষণ পুরু, হাতে পানের বোঁটায় চুন, চোখের কোল
মিশ্‌ কালো, খুবলম্বা কালো চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে, সে চোখের
জ্যোতি নেই, তার সব যেন ঘুমন্ত। কী দেখছে? খগেনবাবু তার
চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিলে। খগেন-
বাবু আবার বসে পড়্‌লেন খাটের এক কোণে। ভয় হল খাট ভেঙ্গে যাবে,
নেমে উবু হয়ে মাটিতে বসলেন, খাট ছুঁতে ভুলে গেলেন। মনে হল সে
লোকটা আর সেই সেখানে। নিশ্চয়ই কোকেন খায়, ভদ্রলোকের ছেলে,
তাই অত শঙ্কিত দৃষ্টি, শ্মশানচারীর মত খরদৃষ্টি নয়। সাবিত্রীর এমনই
চাউনি ছিল কেন কে জানে? তাকে কে যেন জাদু করেছিল, পাড়াগেঁয়ে
মেয়েরা কত বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্র জানে, কিন্তু সে ত' পাড়াগেঁয়ে মেয়েই নয়,
পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ঘৃণাই করত, তার বন্ধুদের মধ্যে সকলেই উচ্চশিক্ষিতা।
কি আশ্চর্য্য! সাবিত্রী বেশী দূর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়েনি, তবু সে পাসকরা
মেয়েদের প্রিয়পাত্রী ছিল। একজন খগেনবাবুকে মুখের উপরই বলেছিলেন,
'আপনি পাসেরই কদর করেন, কিন্তু দেখুন দেখি সাবিত্রীকে, বোঝা যায় যে
ও পাস করেনি?' খগেনবাবু উত্তর দেন, 'সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদে।'
সে রাত্রে তিনি সাবিত্রীকে বলেন, 'তোমাকে ওঁরা অমন পেট্রনাইজ করেন
সহ্য কর কেমন করে? নিজেরা পাস্‌টাস্‌ করে অন্যের প্রতি ও রকম অনু-
কম্পা সকলেই দেখাতে পারে। আমার ভারী রাগ হয়।' সাবিত্রী রাগটাকে
হিংসাই বলেছিলেন। খগেনবাবু নামে আপত্তি জানান, কিন্তু সে আপত্তি
না-মঞ্জুর হয়। তিনি পূর্ব্ব হতেই অন্য অনেক সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন,
তাই বোঝার ওপর শাকের আঁটি তাঁর লঘুভার মনে হল। মৃদুস্বরে এই-
টুকু কেবল বলেছিলেন, 'হিংসে কার আছে আর কার নেই ভগবানই
জানেন!'

এই যে সাবিত্রী আজ হল্‌দে হয়ে খাটের ওপর শুয়ে নিমতলার ঘাটে
পড়ে রয়েছে তার কারণ হিংসে। ব্যাপার কি? সামান্য, অন্ততঃ সামান্য

করে নেওয়া চলত। খগেনবাবুর পিসতুতো বোন কোথা থেকে
এল কোলকাতায়, সাবিত্রীরই বন্ধু, সেই তাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল।
পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে বলে শেষে আফশোষ করেছে।
গান ভালবাসতেন, এই মেয়েটির গলা ছিল ভারী মিষ্টি। সাবিত্রী গান
জানত না, তার দলের কেউই জানতেন না, চেষ্টা করতেন
রমলা দেবীর বিফল প্রয়াসকে সাবিত্রী চরম সার্থকতা বিবেচনা করত,
বাবু করতেন না। ফলে তাঁর পিসতুতো বোন—আঁখিয়ার ('নামটা
ঘরের মেয়ের উপযুক্ত নয়'—সাবিত্রী পরে বলেছিল) আওয়াজ হয়ে
ভীষণ নাঁকি, আর তাল ছন্নছাড়া। সকলে তাঁরা গানের নির্ম্মম সমালো
যাক্ সে সব কথা না স্মরণ করাই ভাল। উবু হয়ে বসে বসে খগেনবাবু
টন্ টন্ ও শিরদাঁড়া ব্যথা করছিল, কাঁধেও ব্যথা, সমগ্র দেহে একটা
আসছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাতেই কাঁধটা টিপতে আরম্ভ করলে
কোলকাতা সহরেও কাঠ, ঘি, পুরুত যোগাড় করতে এত দেরী হয় না
শেষে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করতে হবে বোধহয়। সেটা শ্রাদ্ধের সময় করা
হবে। না; তিনি শ্রাদ্ধ করবেন না, শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রাদ্ধ কি?
প্রায়শ্চিত্তটা মন্দ নয়। যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে—আদালতে,
সমক্ষে, সেই রমলা দেবীর কাছেই সাহায্য নিয়ে।

কাঠের যোগাড়-যন্ত্র হয়েছে, সাবিত্রীকে ঘি মাখিয়ে স্নান করানো
বড় বড় কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরী করে তার ওপর তোলা হল।
কী শক্ত! তার মনের মতন, নির্জীব বলেই কঠিন। এবার মুখে
দেবার পালা। ঐ মুখের সঙ্গে এককালে, সে আজ থেকে বহুপূর্ব্বে,
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, আজ গত কয়েক বৎসর ধরে ঐ মুখ থেকে নানা
শুনে এসেছেন, সবগুলি মিষ্টি নয়, তবে সবই ভদ্রভাষায়। মাজ্জি
ঐ ঠোঁট দুটো থেকে যেন ক্ষরত। গলার আওয়াজই দু' রকমের!
সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় নরম, স্বামীর বেলা ঈষদুষ্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক,
আদরের ও আদর খাবার, অন্যটি আদর প্রত্যাখ্যানের, যেন আদর না
পেয়ে অভিমানিনীর হৃদয় ও মন শুকিয়ে গিয়েছে। হাতে আগুনের
জ্বলছে, ওপর হাতে তাত লাগল। নুড়োটা একটু উঁচু করে ধরলেন।

মশাই বল্লেন, 'এইবার দিন, আর বলুন মন্ত্র, ঐ দেখুন না আমার আরো তিনটে কাজ পড়ে রয়েছে'। খগেনবাবু মন্ত্রোচ্চারণ করে চুলীতে আগুন ধরালেন। কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে, অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কি দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফ্যান পুড়েছে, সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। খগেনবাবু আধখানা চুল বাঁধা দেখে বলেছিলেন, 'যে রাঁধে, সে চুল বাঁধেনা?' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দিয়েছিল, 'এখান থেকে চলে যাও'। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে।··· প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট্ পুট্ করে শব্দ হতে লাগল, গা ফেটে জল বেরোচ্ছে, কি রকম হল্‌দে-রংএর, বার হওয়া মাত্রই উবে যাচ্ছিল। ভীষণ ধোঁয়া! চাওয়া যায় না, চোখ জ্বালা করে, কর্ কর্ করে। হঠাৎ দড়াম ক'রে একটা কাঠ ফেটে গেল। খগেনবাবু চমকে উঠে একটা সিগারেট ধরালেন। একজন লোক লাঠি দিয়ে কাঠগুলো উল্‌টে দিলে, নিবন্ত আগুন আবার জ্বলে উঠল। এই রকম কতবার হয়েছে! নানাপ্রকারে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সাবিত্রীর মনে হয়ত সন্দেহ কমানো গেল, সাবিত্রী নিজে ডেকেই আঁখিয়ার গান শুনেছে, সে গানের সুখ্যাতি করেছে, দিন কয়েকের জন্য সংসার সুখের হয়ে উঠেছে। তার পর, তারপর, হঠাৎ একদিন চা-পার্টি থেকে এসে সে কী কাণ্ড! সাবিত্রী ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই খগেনবাবু একটু যেন চমকিত হয়েই বল্লেন, 'তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।' সাবিত্রী উত্তর করলে, 'বল কি! তোমার আঁখিয়ার চেয়ে? হঠাৎ চমকে উঠলে কেন? আর কেউ আসবে ভেবেছিলে বুঝি?' খগেনবাবুর মনটা মুসড়ে গেলেও হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'তুমি সব চেয়ে সুন্দর। এত যে সুন্দর কখনও ভাবিনি, তাই হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে চমকে উঠলাম।' 'কখনও ভাবনি, অথচ রমলা দি সেদিন বলছিল...' 'দ্যাখ, নজীরের প্রয়োজন নেই, আমার চোখ আছে...ঐ রমলা দেবীই তোমার মাথা খাবেন, তোমার সর্ব্বনাশ করবেন'। 'তোমার চোখ আছে জানি—সেটা আঁখিয়াকে দেখবার জন্যই। রমলা দি যদি আমাকে একটু স্নেহ করেন তাহলে তোমার অত ঈর্ষা হয় কেন বলত? আমার মাথা ত' গেছেই আমার সর্ব্বনাশ যোগ্যা পাত্রীর দ্বারা হলেই ভাল হত! তুমি আঁখিয়ার মধ্যে

কি পাও বলত ?' 'ও সব কথা ছাড়, লক্ষ্মীটি।' 'আদর করতে হবেনা আ
না, তোমাকে বলতেই হবে আজ।' 'ওর মধ্যে ভদ্রতা আছে, স্নেহমমতা আ
ভাল জিনিষকে ও ভাল বলতে জানে, অনেকটা মাসীমার মতন মনে হয়,
বেশী বলতে পারি না।' 'মাসীমার মতন! তাঁর নাম আর করতে হবে
তোমার সঙ্গে তাঁর দেওরঝির বিয়ে দিয়ে গিন্নীপনা করতে পারলেন
রাজ-রাণী হতে পেলেন না, তাই মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন। তাঁর
আর বোলো না। ভাল বলতে জানে! জানে ও ছলাকলা। কী
ব্যবহার করে ওর স্বামীর সঙ্গে তা আমার জানা আছে—ওর ননদের শ্ব
বাড়ী রমলাদির বোনের বাড়ীর পাশে—তুমি যদি ওর নাম কর আবার
হলে আমি আর ভদ্রতা রাখতে পারব না, বিষ খেয়ে মরব।' এই বলে
কানের দুল খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার আগুন জ্বলে ওঠে। বিষ অ
খায়নি, তবে ঐ রকম তুচ্ছ ব্যাপারেই খেয়েছিল।

আগুন প্রায় নিবে এল। রমলা দেবীর আত্মীয়েরা একটু ব্যস্ত হ
উঠেছেন। পুরোহিত ঠাকুর হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, 'এই বার
কাজটি করতে হবে, নাভিকুণ্ডলটি বার করুন, আত্মঘাতিনীর কার্য্যে দক্ষি
আমরা বেশী নিয়ে থাকি।' বয়োজ্যেষ্ঠটি বল্লেন, 'সে হবে এখন, বি
বার কর ত' ভাই।' পুরোহিত ঠাকুর তখন অন্য একটি নবাগত শবের দি
চেয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'দেরী করবেন না, ইত
করছেন কেন? স্ত্রীর বুঝি সন্তান-সম্ভাবনা? তা হলে এলেন কেন
ও কি! আপনি কেন যাচ্ছেন? এ ত' স্বামীর কর্ত্তব্য, সহধর্ম্মিণী
খগেনবাবু লাঠির ডগা দিয়ে ছাই ঘেঁটে একটা পোড়া মাংসপিণ্ড
করলেন। সাবিত্রীর শেষ চিহ্ন! দুটো মাল্সার মধ্যে চাপা দিয়ে না
কুণ্ডলীটা নিয়ে গঙ্গার ধারে অগ্রসর হলেন, অন্যান্য সকলেই এলে
মন্ত্রোচ্চারণ করে মালসাটা যতদূর পারেন দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে
মনে মনে খগেনবাবু বল্লেন, 'তোমার আত্মা- যদি থাকে, তবে তার
হোক্।' মেয়েদের হিংসা-দ্বেষ এই নাভিকুণ্ডল থেকেই ওঠে। এই
যোগ-সূত্র, বংশ-পরম্পরায়। সবই এদের নাড়ির টান। কে জা
পরজন্ম যদি থাকে তা হলে সাবিত্রী যেন আর মেয়েমানুষ হয়ে না জ

বাঙ্গালী হিন্দু-পরিবারের মেয়ে হওয়ার চেয়ে পশুজন্মও ভাল। ছিঃ ছিঃ—ছিঃ! আত্মঘাতিনীর মানবজন্ম হয়ও না। মেয়েদের আবার আত্মা! হিন্দু-শাস্ত্রেই আছে—কি আছে খগেনবাবুর ঠিক মনে পড়ল না, তবে নিশ্চয়ই আছে ঐ ধরণের কথা। তারপর কলসী করে জল এনে চুলী নেবাবার পালা, পুরোহিত-বিদায়, বিছানা-ভাগ, পোড়া গহনা খোঁজা, শ্মশান-বন্ধু ও কনষ্টেবলকে বক্সীস দান, তারপর স্নান। তোয়ালেটার বেশ গন্ধ! কার তোয়ালে কে জানে?

খগেনবাবুর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল—কাঁধে ভীষণ ব্যথা, কলসী বয়ে হাত টন্ টন্ করছে, ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে গোছ ফুলে উঠেছে, পায়ের তলায় পাকা ফোড়ার মতন ব্যথা, রোদ্দুর ও আগুনের তাপে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বলছে, কর্ কর্ করছে ধোঁয়া লেগে। দু'খানা ট্যাক্সী আনতে বলে একটা সিগারেট ধরালেন, জিব শুকনো ভাল লাগল না, একটা পান খেলে হয়, এখন খাওয়া যায়না, সিগ্রেটটা ফেলে দিলেন। একটা ট্যাক্সী এল, আর এল সেই নতুন মডেলের শেভ্রলেট। বনেটের সাদা ক্রোমিয়ম প্লেট-গুলো গ্যাসের আলোয় ঝক্ ঝক্ করে উঠল। খগেনবাবু ট্যাকসীতে উঠ্তে যাচ্ছিলেন—বিজন বল্লে, 'না, এই গাড়িতে উঠুন।' মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই গাড়িতেই উঠ্লেন, হুড ঢাকাই ছিল। গাড়ি বিডন্ ষ্ট্রীটে এসে পড়ল। দুধারের বাড়ীর দোতলার বারাণ্ডায় দু'একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে গান চলছে, 'দুল্ দুল্ টুল্ টুল্, ভরা যৌবন...ব্যথার ব্যথী,' সব বাংলা—সব গজলের সুর। একটা ঘরের ভেতর একটা বড় আলোকচিত্র চোখে পড়ল—মাথায় পাগড়ী-বাঁধা কোন শিক্ষিত সাধুর। গাড়ি জোরে ছুটছে—রাস্তার আলো এক একবার যাত্রীর মুখের ওপর পড়ছে, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, আবার অন্ধকার। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএর দক্ষিণে হাওয়া, শোভা-বাজার, বাগবাজার অঞ্চলের বনেদী বাড়ীর বড় বড় গাড়ি পালতোলা নৌকোর মতন মন্থরগতিতে বাড়ী ফিরছে, এঞ্জিনের আওয়াজ নেই, সাহেবদের গাড়ি তাদের অতিক্রম করে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটছে। সঙ্গের ট্যাক্সীটা এগিয়ে চলল। ট্যাক্সীর নম্বর অন্য ধরণের, সব T দেওয়া। খগেনবাবু গাড়িতে ভাল করে ঠেস্ দিয়ে বসলেন, চোখ বুজতে পারছিলেন না, আগুন ও আলোর

শিখা চোখ বুজলেই নেচে উঠছিল। চিরকালই জ্বলবে না কি ?
জ্বালা কমলে শান্তি পাওয়া যায়। কবে চোখ স্নিগ্ধ হবে ?

গাড়ি সেই মির্জ্জাপুরের গলির মধ্যে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ি
পূর্ব্বের গাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এক মালসা আগুনের ওপর
তাতাচ্ছেন। খগেনবাবু গাড়ি থেকে নেমে আগুনের দিকেই গেলেন
সকলে একটু নিমপাতা ও মটরডাল চিবুলেন, খগেনবাবু পিছনেই দাঁ
রইলেন। চাকরে জল ও তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তিনি প্রথমেই
পা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলেন—তোয়ালেটা ভিজিয়ে রাখা হয়েছে—
গন্ধ। রমলা দেবী এক গেলাস সরবৎ নিয়ে যখন এলেন, তখন খগে
নীচের ঘরের তক্তপোষের ওপর শুয়ে, লাফিয়ে উঠে এক চুমুকে
গেলাসটা নিঃশেষ করলেন। বুকটা ঠাণ্ডা হল। চোখে বড় কষ্ট হ
রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোলাপ জল এনে দিই ?' 'বড় ভাল
রমলা দেবী গোলাপ জলের শিশি আনলেন, খগেনবাবু হাতের
গোলাপজল নিয়ে চোখ ধুলেন। খানিক ক্ষণের জন্য চোখ ঠাণ্ডা হল, খ
বাবু চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। আবার জ্বলতে লাগল, চোখ খুলে
রমলা দেবী হাতে শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে মধুর গলায় জি
করলেন, 'এখনও কষ্ট হচ্ছে না কি ? একটু মাথায় দিন।' খগে
খানিকটা ঢেলে মাথায় দিলেন।' 'কিন্তু চোখের ভেতরে আগুন জ্বল
'আচ্ছা, চোখ বুজে শুয়ে থাকুন, আসছি।' রমলাদেবী ড্রপার নিয়ে এলে
খগেনবাবু উঠে বসতে চাইছিলেন। 'উঠে বসলে দেওয়া যাবেনা, শু
থাকুন।' বড় তাকিয়ার ওপর মাথা রেখে খগেনবাবু শুয়ে পড়লেন,
দিয়ে নিজের চোখের পাতা ফাঁক করলেন, রমলাদেবী তাঁর ডান চোখে
দিয়ে দু' ফোঁটা গোলাপজল ফেল্লেন। মাথার ওপর পাখাটা
ঘুরছিল, বাঁ চোখে ফেলবার সময় মাথার ওপর শাড়ির অংশটা উড়ে
ওপর নেমে গেল। সামলাতে গিয়ে বাঁ-চোখের ওপর দশ বার
পড়ে গেল। গড়িয়ে সেটা মুখের মধ্যে যাচ্ছিল। হাতের
তোয়ালে না থাকার দরুণ রমলা দেবী 'আমি একটা অপদার্থ' বলে
আঁচলটা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। খানিকপরে বল্লেন, 'আবার ডান

খুলুন, পড়েনি।' 'পড়েছে।' 'না, মাত্র দু'এক ফোঁটা, খুলুন।' বাঁ-চোখটায় আরাম হচ্ছিল, ডান চোখটায় হচ্ছিল না। খগেনবাবু ডান্ চোখটা আবার খুললেন, ফোঁটা ফেলবার সময় রমলা দেবীর হাতটা কাঁপছিল। বেশ ফর্শা দেখাচ্ছিল হাতটা, সোনার চুড়ীর রংএর সঙ্গে বেশ মিলে গিয়েছিল, মনঃসংযোগের একাগ্রতায় মুখে একটা দিব্যভাব এসেছিল। চার পাঁচ ফোঁটা পড়বার পর খগেনবাবু বল্লেন, 'আর না।' তারপর চোখ বুজে শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির দাস

কবিতা-গুচ্ছ

সঙ্গতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবেনা গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয়-কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখী উড়ায়েচে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার স্থষ্টি, আমার স্থষ্টি, তাঁর স্থষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধূলো,
যারা স'রে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কী রয়েচে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেচে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্ম্মে আছি বর্ম্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাগর-তীরে

বালুর বেলায় জল-কন্যারা না কি
মুক্তার মত শাদা হাসি হাসে গভীর রাতে,
ঢেউরা যখন কালো পাহাড়ের পাথর ঘিরে
ডানা ঝাপ্‌টায় খাঁচার পাখীর মতো ?

দূর সাগরের ঢেউএর ফেনার কোলে
জল-কন্যারা চেয়ে থাকে না কি আকাশ-পানে,
মুঠো মুঠো তারা বিছায়ে আকাশে আঁধার বুঝি
ছায়া-পথ রচি' গোপনে তাদের ডাকে ?

পাপ্‌ড়ির গালে শিশির পড়ার মতো
লঘুপদে যদি যাও কোন দিন সাগর তীরে,
ছায়ার মতন কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়াবে, দেখো,
ছায়াপুরী ছেড়ে জলকন্যারা সবে।

সজল নিটোল নীল আঁখি-পানে চেয়ে
স্বপন আনিও নয়নে, কয়ো না একটি কথা,
কথা যদি কও দেখিবে কোথায় মিশেছে তারা
সুমুখে সাগর করতালি দেয় শুধু।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সনেট

১

আসন্ন বিদায়ক্ষণ অস্বীকার করিবারে আর
উপায় র'ল না কোন। নিশ্চিত জানিনু চিত্তমাঝে
চঞ্চল তরণী ভরি' রজ্জুতে রজ্জুতে এবে বাজে
যাত্রার আভাসধ্বনি, বিদায়ের অশ্রু হাহাকার।
রৌদ্রধৌত নভস্তলে দাঁড়াইয়া হেরিলাম দূরে
ক্ষীণ হয়ে আসে তট, ক্ষীণতর নরনারীদল
যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে থাকে নিস্পন্দ নিশ্চল,—
উজ্জ্বল আলোক কাঁপে চিত্ত ভরি' বিরহের সুরে।

অসহায় বেদনায় দূর হ'তে রিক্ত আঁখি মেলি'
আমি শুধু চেয়ে থাকি। শুধু দেখি তুমি উদাসীন
নয়ন মেলিয়া সখি কুসুম-অলস করতলে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছ। নীল সিন্ধু উঠিল উদ্বেলি'
নিষ্ঠুর বিদ্রূপভরে। দেখিলাম অশ্রুবাষ্প জলে
ম্লান মুখচ্ছবি তব দূরান্তরে হয়ে এল লীন।

২

আসিয়া দেখিনু সখি দীর্ঘচ্ছন্দা দেহখানি তব।
সেই পরিচিত গৃহে, সেই পরিচিত শয্যাপরে,
এখনো সে চেনা হাসি রহিয়াছে আভাসে অধরে,
এখনো রয়েছে অঙ্গে সেই রক্ত বাসখানি নব।
শিথিল দক্ষিণ বাহু হেলায় রয়েছে পড়ি পাশে,
ললাটে অলকচূর্ণ, অনুপম মুদিত নয়ন
—সুখের শয়নে যেন রহিয়াছ স্বপনে মগন,
বুকের বসন যেন এখনো কাঁপিছে মৃদু শ্বাসে।

হৃদয় স্পন্দন মম থামি গেল সহসা নিমেষে।
সহসা মুছিল মোর ধরণীর যত রূপ হাসি।
দেখিলাম জগতের কালজীর্ণ প্রাচীন কঙ্কালে
মৃত্যুর লিখন লেখা। জানিলাম লেখা ছিল ভালে
দাঁড়ায়ে প্রাণের কাছে অসঙ্কোচে স্নিগ্ধ হাসি হেসে
সুদীর্ঘ জীবন ভরি' আর কভু ডাকিবে না আসি'।

হুমায়ুন কবির

অনুরোধ

একদিন যারা কাছে ছিল, ছিল প্রিয়
কালের প্রবাহে সখি তাদের ভুলিও।
জীবনের বন্ধুর তরঙ্গাকুল পথে
হয়তো পথের বাঁকে দৃষ্টিপথ হ'তে
অকস্মাৎ চলে যায়,—যেমনি সহসা
একদিন এসেছিল। নিশির তমসা
মূর্ত্তিখানি হয়তো মুছিল অন্ধকারে।
তুমি থামিলে না,—এলে রাত্রি পরপারে।

যারা ছিল প্রিয় একদিন, আজি তারা
কেবল মনের স্মৃতি ক্ষীণ—বস্তুহারা
দেহহীন প্রেত। স্মৃতির কঙ্কাল টানি'
প্রেম নাহি বাঁচে, শুধু চিত্তে বাড়ে গ্লানি।
পুরাতন প্রেম যদি আজি ছায়া সম,—
নামুক হৃদয় ছেয়ে বিস্মৃতির তম।

হুমায়ুন কবির

অবিনাশী

সত্য যাহা চিরকাল সত্য তাহা রবে।
একদিন মিথ্যা তারে মনে হ'তে পারে,
একদিন বেদনায় তপ্ত অশ্রুধারে
ভুলিতে চাহিবে ভালো বেসেছিলে কবে।
তবু ভুলিবে কি কভু ? অন্তরের তব
ভাণ্ডারে সঞ্চিত রবে অতীতের স্মৃতি,
আনন্দ-বেদনা-অশ্রু মুখরিত গীতি
ঐশ্বর্য্য রচিবে চিত্তে নিত্য নব নব।

সংসারের স্রোতধারা দূর হতে দূরে
দুর্ব্বার আবেগভরে ফেলিবে টানিয়া
পুরাতন জীবনের ছিন্ন খণ্ডগুলি।
—তবুও হৃদয় ভরি' পরিচিত সুরে
অকস্মাৎ স্মৃতি যবে উঠিবে ধ্বনিয়া
চিত্ত স্তব্ধ চেয়ে রবে বর্ত্তমান ভুলি।

হুমায়ুন কবির

বসন্ত-বিদায়

চৈত্রের চিতার পরে রাখি বামপদ, নতমুখে
বারেক ফিরিয়া বধূ কহিলো : এবার আসি তবে।—
বসন্ত বাতাসে ভাসি এসেছিনু যৌবন-উৎসবে
বাসনার পুণ্যতীর্থে ; মধুমাসে ফুটেছিনু সুখে
প্রগল্‌ভা পুষ্পসম বারংবার মর্ম্মান্ত কৌতুকে
তোমারে বিভ্রান্ত করি ; অনুরাগে তুলে নিলে যবে
দুঃসহ হৃদয়াবেগে শিহরিয়া পুলকে গৌরবে
টুটিয়া লুটিয়াছিনু বেদনা-বিহ্বল তব বুকে।—

তুমি এই পৃথিবীর বলদৃপ্ত পরুষ যৌবন—
কণ্ঠে বাণী কলবাক্, বক্ষে উষ্ণ আসঙ্গ-আশ্লেষ ;
দুরূহ সাধন-লব্ধ দিলে মোরে তব শ্রেষ্ঠ-ধন!
সে তব বিহ্বলগান ফুটিলো যা কামনা মুকুলে
দোঁহার তৃষ্ণার যজ্ঞে! আক্ষেপের নাহি অবলেশ ;
আমার যা ছিল সব রহিলো সে ঝরা ফুলে ফুলে।

সুফী মোতাহার হোসেন

তরুর উদ্বোধন

(প্রকাশ্যে)

রবি, আমায় তুমি বাসো না ভালোবাসো না
কভু বাসো না :
তাই ভুলেও তুমি আমার কাছে আসো না
কই, আসো না!

আমি নিত্য তব চরণপানে
বিথারি বাহু বরণ-তানে ঃ
তবুও তুমি মেঘ-আড়ালে
পলাও ; কেন হাসো না
ফুটে হাসো না ?
না না ঃ যারেই ভালোবাসো না কেন
তরুরে ভালোবাসো না
কভু বাসো না।

(স্বগত)

বুঝি মেলিতে শাখা সূর্য্য পানে
গোপন মূলে ছায়ার টানে
র'য়েছে বাধা লুকায়ে—
মোর লুকায়ে ?
বুঝি ভালো না বেসে চাই যে ঃ ভালো
বাসুক মোরে অরুণ-আলো,
যায় না মোহ মিলায়ে
তাই মিলায়ে ?
তাই কুহেলি হেন কৃষ্ণ হয়ে
ছায় হিমে এ-বক্ষ ?
ভুলি ঃ লীলায় ফুলজীবনরস
উথলে রবি-লক্ষ্য ?

(প্রকাশ্যে)

রবি, রহিতে ফুল-লক্ষ্য তুমি চাও না
কভু চাও না ঃ
তাই এ-প্রাণমূলে তোমার সুর গাও না
কভু গাও না।

তাই পাতালে বাঁধি' রাখিলে মোর
নীল-উদাসী নেত্র ; ঘোর
আলোক হানি' নিচের টান
উন্মূলিতে দাও না
আজও দাও না ;
না না ঃ যারেই তুমি চাওনা ভানু,
তরুরে কভু চাও না
স্নেহে চাও না।

(স্বগত)

বুঝি পাতালতলও সবিতা-স্নেহ
সাধিছে ! গুহা বিরহী—সেও
রশ্মি আজি বরিবে
প্রেমে বরিবে !
রাজা তিমিরে মোরে পাঠাল তাই
অগ্রদূত সম ? সেথাই
নিখিল-মন মোহিবে
আরও মোহিবে ?...
তবু কেন যে ক্ষোভ কৃষ্ণ হ'য়ে
ছায় প্রাণে অশান্তি !
ভুলি ঃ উর্দ্ধমূল কুসুম-দূত
নিম্নটানই ভ্রান্তি !

(প্রকাশ্যে)

রবি, স্বগত ছাঁদে মিছে প্রবোধে ভুলাবে
কারে ভুলাবে ?
যদি সত্য আলো—মেঘতরাসে লুকাবে
কেন লুকাবে ?

যদি পাতালও চায় দূরিতে ধূমে,
কেন সে মোরে জড়ায়ে ঘুমে
রহে এখনও ?—কেন বা তুমি
পিপাসা নাহি পূরাবে
আজও পূরাবে ?
না না ঃ যারেই কেন দাও না ধূপ
মোর ছায়া না লুকাবে
কভু লুকাবে।

(স্বগত)

বুঝি দিবস-সুর রজনী-রাগে
জ্বলে নবীন সুষমা-ফাগে
ঝুরিয়া হোলি-দ্যোতনা
নব দ্যোতনা ?
তাই অন্ধ রসাতলও মাগিল
তোমারে ?—চিরনিশা চাহিল
তপন-অনুমোদনা
উদ্বোধনা ?
বুঝি আত্মপ্রেমই দীরঘ-শ্বাসে
নিবারে আলো-ধর্ম্ম ?
রুধে তাই কি নব-দিগ্বিজয়ে
কোটি জড়িমা-বর্ম্ম ?

(প্রকাশ্যে)

ও কী ! সহসা কার বারতা কানে পশিল
আজি পশিল ?
শুধু নহে তো কানে—অন্তরেও ধ্বনিল
সে যে ধ্বনিল !

তাই সহসা বুঝি অচিন মায়া
ধরিল পরিচিতের কায়া ?
না বুঝি বিভাবসুর বাণী—
তবু পাষাণ সরিল
প্রাণে সরিল।
কার কিরণ-ভূমিকম্পে ?—বুকে
হিরণকর পশিল
কার পশিল ?

(স্ফুট)

আজি স্বগত-উষা মধ্যদিনে
বিকচি'—টুটি' জাঙাল হীনে
যুগের তমী ভাসায়ে
দিল ভাসায়ে !
কাঁপি' অতল-মূল সে-হিল্লোলে
রূপান্তর-ছন্দ-দোলে
অপ্রেমেরে লুটায়ে
দিল লুটায়ে !
তাই মুগ্ধ অভিমান আজিকে
মুছিল ঃ জ্যোতিস্বপ্ন
উরি' জাগর-বুকে ঝঙ্কারিল
যুগান্তর-লগ্ন !

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সৃষ্টিরহস্য

আয়ুর সোপানমার্গ বহু কষ্টে অতিক্রম করি
উন্মুক্ত মৃত্যুর প্রান্তে উর্দ্ধমুখে দাঁড়ায়েছি এসে ;
সিন্ধুর ভাস্বর আঁখি খোঁজে মোরে নিম্নে নিরুদ্দেশে,
আমার আরতিদীপ শূন্যতায় সাজায় শর্ব্বরী ॥

সম্মুখে নিখিল নাস্তি, পাছে মোর মৌন নীরবতা ;
প্রশান্তি দক্ষিণে বামে, জনহীন অন্তর বাহির ;
তবু কার আবির্ভাবে কণ্টকিত আমার শরীর,
অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা ?

তবে কি বিরাট শূন্য শূন্য নয়, সাগরের প্রেত,
উদ্বেল বিক্ষোভ তার পরিণত অমূর্ত্ত ঈথারে ?
তবে কি দুর্ম্মর মর্ত্ত্য ক্রন্দসীতে ক্রন্দন বিথারে,
শস্যের মিসরী শবে উপ্ত বন্ধ্য ভবিষ্যের ক্ষেত ?

নির্লিপ্ত আলোর দ্বীপ নয় ওই দিব্য নীহারিকা,
কালের প্রপাতে মগ্ন বাসনার ভাসমান ফেনা ;
অবচ্ছিন্ন তারারাশি, ওরা চিরদিনকার চেনা
পশুদের স্থূল সত্তা, মূর্ত্তিমান গৃধ্নু বিভীষিকা ॥

নাই নাই মৌন নাই, সর্ব্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ ;
নির্ব্বাণ—বুদ্ধির স্বপ্ন, চিরঞ্জীব জ্বলন্ত হৃদয় ;
হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয় ;
জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ ॥

কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ, নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন,
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা, সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই, মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দ

পুস্তক-পরিচয়

বিচিত্রিতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু চিত্রিত প্রচ্ছদ ও অনুচ্ছদসহ চমৎকার বাঁধাই।

বিচিত্রিতা কাব্যগ্রন্থখানি কয়েকখানি পরমসুন্দর চিত্রে শোভিত। স্বয়ং কবি, শিল্পী-শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌরীদেবী, সুনয়নী দেবী, প্রতিমা দেবী, নিশিকান্ত রায় চৌধুরী, মণীষী দে, প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা এই ছবিগুলি আঁকিয়াছেন।

এখানে কবিতা কয়টিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব। এগুলির মূলসুর "আশীর্ব্বাদ" কবিতাটিতেই রহিয়াছে, সেটি হইতেছে পঞ্চাশ বৎসরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ। কবি ও শিল্পী উভয়েরই রচনার মধ্যে বাসন্তিক স্পর্শ রহিয়াছে, এই স্পর্শ অনন্তরেই স্পর্শ। ইহাই তাঁহাদের সৃষ্টির ভিতরকার কথা। শিল্পীকে সম্বোধন করিয়া কবি তাঁহার নিজের মনের কথাই বলিয়াছেন,—

> বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
> তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত।
> বিধির সাথে কেমন ছলে
> নীরবে তব আলাপ চলে,
> সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত।
> ... ...
> চির-বালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
> তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
> তোমার সেই তরুণতাকে
> বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
> অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা প'রে।
> তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে
> নব বালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
> ভাবনা তা'র ভাবায় ডোবা,—
> মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
> দেখাও তা'রে, ছুটেচে মন তোমার পথে যেতে ॥

কবিতাগুলিতে এই বার্দ্ধক্যবিজয়ী যৌবনের আভাসই পাই, অসীমের দিকেই তার টান; সেইজন্যই অনন্ত বিশ্বের সুর এমনি করিয়া এখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলি একেবারেই স্বচ্ছন্দ, গভীর দার্শনিকতার সুর এখানে ত আছেই কিন্তু আরো বেশী আছে উপলব্ধির প্রকাশ। বিশেষের নিজস্ব আত্মগত স্বরূপটি কবির "সৃষ্টি করা দৃষ্টিতে" ধরা ত দিয়াছেই, কিন্তু তাহার পিছনে অসীম কালের যে পটটি রহিয়াছে তাহাও সকল সময়ে তাঁহার চিত্তাকাশে বিরাজ করিতেছে। মানবজীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে বিশ্বখেলোয়াড়ের খেয়ালটিকে তিনি দেখিতে পাইতেছেন। সব কিছুই তাঁহার মনে অনন্তের বাণী আনিতেছে।

বিচিত্রিতায় কবির মনের যে কথা প্রকাশ পাইয়াছে সে কথা তিনি আগে কাব্যে কয়েক বারই বলিয়াছেন, এবারেও সে সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে একটি মহিমায়, একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে। এই নিরাভরণ, এই সরল হৃদয়াবেগ, অনুভূতির স্পর্শ, ইহার মূল্য নিরূপণের চেষ্টার কথা ত মনেই আসে না; সমস্ত মন ইহাকে উপভোগ করিতে হয়। এখানে প্রেম প্রেমাস্পদের সত্যতম সত্তাকে চা আবার সেই সঙ্গেই নিজেরই সত্যতম সত্তাকে প্রকাশ করিয়াছে।

বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
ফিরিনু সে কী সন্ধান তরে
সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে॥
অবশেষে দেখিলাম কত জন্মপরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি
তুমি পেলে চরমের বাণী॥
তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্ম্মতলে
একটি যে মূল সুর চলে
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল॥
কী যে বলে সেই সুর, কোন্‌দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি বুঝিলাম আমি,
সুন্দর আমাতে আছে থামি,'
তোমাতে সে হোলো ভালোবাসা॥ (পুষ্প)

সৃষ্টিলীলার রহস্যের কথা রহিয়াছে আরো কয়েকটি কবিতায়; বিশ্বরচনার বাসনা, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র প্রকাশেও সেই একই বাসনা। এক বৃন্তে যুগলকে দেখি সেই জগৎপ্রবাহেরই ধারার স্পর্শকেই মনের মধ্যে পাইতেছেন,

আমি থাকি একা,
এই বাতায়নে ব'সে এক বৃন্তে যুগলকে দেখা,
সেই মোর সার্থকতা।......
সমস্ত বিশ্বের মর্ম্মে যে-চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশ ধারায়
নিখিল ভুবনে নিত্য যে-সঙ্গীত বাজে
মূর্ত্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে॥ (যুগল)

বিশ্বের মধ্যে বিশেষকে এবং বিশেষের মধ্যে বিশ্বকে দেখার সাধনাই কবির সাধনা. সেই উপলব্ধিই কবির শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। "বিচিত্রিতা"র কয়েকটি কবি উপলব্ধির ধ্বনিই শুনিতে পাই। সমস্ত সুপরিচিত, অব্যবহিত বর্ত্তমান অন্তরালে সেই অসীম অনন্তের বোধই রহিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে "সাম্প্রতের

হইতে খসিয়া যাইতেছে, নিখিল প্রাণের ছোঁওয়া সকলেরই অন্তরকে উদাস করিয়া দিতেছে। "পসারিণী"কে কল্পনা কাব্যগ্রন্থে যখন দেখিয়াছিলাম তখন তাহার করুণ কোমল ক্লান্ত কায়টিই চোখে পড়িয়াছিল, "ঘুঘু ডাকে ঝিল্লিরবে, কি মন্ত্র শ্রবণে কবে, মুদে যাবে চোখের পলক।" বিচিত্রিতার "পসারিণী" কবিতাটিতে পসারিণীর ধ্যানের মন্ত্রটিই আকার পাইয়াছে,

আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখো তাহা আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কারধ্বনি বাজে
গুঞ্জরি উঠিল তোর বুকে।
পসারিণী. ওগো পসারিণী.
ক্ষণকাল তরে আজি ভুলে গেলি যত বিকি-কিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,
অনন্তের বাণী আনে
সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা॥

প্রকাশিতের মধ্যে অপ্রকাশিত, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যই বার বার আকার পাইতেছে, "যা দেখিছ তা'রে ঘিরেছে নিবিড় যা দেখিছনা তারি ভিড়"; পুষ্পচয়িনীর অঙ্গসাজের মধ্যে বহুদিনের আভাসই উঁকি দিতেছে,

মনে হয় যেন তুমি ভুলে-যাওয়া তুমি,—
মর্ত্তভূমি
তোমারে যা' ব'লে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।

কবি তাঁহার কবিতায় সেই সম্পূর্ণ পরিচয়ই দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার প্রেমের দৃষ্টিতে সীমারও সীমা হারাইয়া গিয়াছে,

সে ছায়া তো ফিরিল না, সে আমার প্রাণে
হোলো প্রাণবান্‌।
দেখি, ধরা পড়ে গেল কবে মোর গানে
তোমার সে দান।
* * * *
কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃত স্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে
হারায়েছে সীমা।

উষা-তরুণী তাহার "প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দরের" যে বর পাইয়াছে, তাহার উ
প্রতিভাষণের বাণী পাঠাইতেছে,

বলো তারে, হে অজানা, জানি আমি জানি,
তুমি ধন্য, তুমি প্রিয়তম—
নিমেষে নিমেষে তুমি চিরন্তন মম।

এই গ্রন্থের শেষ কবিতা "বিদায়" যাত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, কবি তাঁহার স
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যই তাঁহাকে দান করিতেছেন,

আজি মোর চোখে
কাছের মূর্ত্তির চেয়ে দূরের মূর্ত্তিতে তুমি বড়ো।
অনেক দিনের মোর সব চিন্তা করিয়াছি জড়ো,
সব স্মৃতি
অব্যক্ত সকল প্রীতি, ব্যক্ত সব গীতি,
উৎসর্গ করিনু আজি যাত্রী তুমি, তোমার উদ্দেশে
স্পর্শ যদি নাই করো যাক্ তবে ভেসে।

"বিচিত্রিতার" কয়েকটি কবিতাতে নারীর প্রকৃত মহিমারই জয়ধ্বনি বা
উঠিয়াছে। পূরবী, মহুয়া, পরিশেষ কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে সুর শুনিতে পাই তাহাই আ
এখানেও ধ্বনিত হইয়াছে, "প্রকাশিতা" কবিতায় অধিকারগর্ব্বভরে অহঙ্কৃত বর ত
ছায়েবানুগতা বধূর "ছোটো" রূপটিই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু কবি জানেন যে এক
এই সঙ্কোচের আবরণ দূর করিয়া বধূ তাহার সত্যরূপই প্রকাশ করিবে।

আজিকে এই যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে গূঢ় তব জয়ধ্বনি।
জিনি লবে তোমার সংসার, হে রমণী,
সেবার গৌরবে।
যেজন আশ্রয় তব তোমারি আশ্রয় সেই লবে। (প্রকাশিতা)

এখানে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিব, সেটি "কুমার" এই প্রসঙ্গে
"পথিক" ও মহুয়ার কয়েকটি কবিতা স্মর্ত্তব্য, "পথিক" একাই পথে বাহির হইতে
তাহার সঙ্গিনী হইবার সাহস নারীর নাই, বরং করুণ কলগীতে সে বিদায় পথে
দিয়াছে, কিন্তু "বিচিত্রিতায়" নারী যাত্রীর রথসঙ্গিনী হইতেই চাহিয়াছে, মরণ
সহিয়া লইতেই তাহার আগ্রহ—

উদ্দেশহীন দুর্গম কোন্‌খানে
চলো দুঃসহ দুঃসাহসের টানে।
দিল আহ্বান আলস-নিদ্রা-নাশা
উদয়কূলের শৈলমূলের বাসা,
অমরালোকের নব আলোকের ভাষা
দীপ্ত হয়েছে দৃপ্ত তোমার প্রাণে॥
চাহে নারী তব রথসঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহ ভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে।
গ্রহণ করিও সম্মানে সমাদরে,
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘো

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন বিরচিত।

প্রবন্ধের বই। বেশীর ভাগ প্রবন্ধই সমালোচনামূলক। বইয়ের শেষে কতকগুলি পত্র ও গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে দৈনিক ও মাসিকপত্রে যে সব সমালোচনা বের হয়েছিল তার কিছু কিছু আছে।

আজকালকার অনেকেই স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের নাম শোনেন নি। কিন্তু তাঁর সময়ে—তাঁর সময়কে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের যুগ ব'লে অভিহিত করেছেন—তিনি একজন বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক ছিলেন। তখনকার অনেক সাহিত্যিকই তাঁর সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা ক'রে সুখী হতেন। বয়সে রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় হ'লেও তিনি ছিলেন কবিবরের একজন বিশিষ্ট ও গুণমুগ্ধ বন্ধু। মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে লিখ্‌ছেন—"তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় তাঁর ছিল অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হোতো।...আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল"। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের বাড়ী ছিল—"বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি তীর্থ"।

দুঃখের বিষয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় বেশী লিখে যেতে পারেন নি। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁর যে সব গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি একসঙ্গে করে "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি" নাম দিয়ে বার করা হয়েছে।

সমালোচনা দু'দিক থেকে হ'তে পারে। এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা লোকশিক্ষা বা নীতিজ্ঞান সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধরে নেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক নিছক সৌন্দর্য্যের উপাসক। এই শ্রেণীর সমালোচক সাহিত্যে যা খোঁজেন তা' রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের নিকট একখানা চিঠিতে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং আচরণের সৌন্দর্য্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত, কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে না গিয়ে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপকারিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে হয়। কিন্তু ধর্ম্মনীতির সৌন্দর্য্য যে সৌন্দর্য্য নয় একথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তেমনি সুন্দর—কেবল তা' অতিরিন্দ্রিয়ের গোচর এই যা তফাৎ।" প্রিয়নাথ সেন মহাশয়, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন বলে মনে হয়। সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারে তিনি লোকশিক্ষা বা নীতিজ্ঞানের বিশেষ আমল দেন নি। তাঁর মতে, "সকল কলাবিদ্যার যে কার্য্য—যে উদ্দেশ্য—রসসাহিত্যেরও তাহাই—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করা। এক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুমতিপত্র লইয়া ত্রিভুবনের যত্র তত্র সাহিত্যের অবারিত গতি।......কেবল সৌন্দর্য্যের উদ্ভাবন হইলেই হইল অর্থাৎ উদ্ভাবিত রস এবং বর্ণিত বস্তুকে সৌন্দর্য্যের আলোকে মণ্ডিত করিতে হইবে।" এই মাপকাঠি দিয়েই গ্রন্থকার সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করেছেন। এমন কি Ruskin যাঁর মতে—He is the greatest artist who has embodied in the sum of his works the greatest number of the greatest ideas—সেই রাস্কিনেরও লেখার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেছেন—এই মাপকাঠিরই সাহায্যে।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে চার পাঁচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উল্লেখযোগ্য প্র-গুলির মধ্যে আবার বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমালোচনা। প্রতি সমালোচনা নয়, অনুকূল সমালোচনা। এখন হয়ত রবীন্দ্রনাথের রচনা সমালোচ বাইরে চ'লে গেছে, কেননা রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ লোক খুব কমই আছে। কিন্তু এমন কাল গেছে যখন বিরুদ্ধ সমালোচনাই কবিবরের ভা জুট্‌ত বেশী। প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি সেই সময়ে লেখা। যখন প্র প্রকাশ হয় তখন প্রবন্ধগুলির যে দাম ছিল, সে দাম হয়ত এখন আর দেওয়া চলে ন কিন্তু তা হ'লেও, এই রচনাগুলির ভেতর এত সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যবিশ্লে করবার ক্ষমতার পরিচয় আছে যে মনে হয় যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার শুধু অন্ধভক্ত না হ'তে চান, যাঁরা বুঝে শুনে কবিবরের রচনার প্রশংসা করতে চান, এই বই থেকে তাঁরা অনেক সহায়তা পাবেন।

অন্যান্য প্রবন্ধগুলির ওপরেও সেন মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিশ্লে শক্তির ছাপ বেশ স্পষ্টই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। "সনেট পঞ্চাশতের" আলোচনায় তিনি সনেটের উৎপত্তি ও বিকাশের একটি সুন্দর ইতিহাস দিয়েছেন। তাঁর সমালোচ আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতারই সমালোচনা করুন অথবা প্রম চৌধুরী মহাশয়ের বা রাস্কিন বা মোপাসাঁর সমালোচনা করুন, তাঁর সমালোচনা ন সময়েই তুলনামূলক। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করার পর তিনি তাঁর ম প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় সমালোচনার বই খুবই কম। স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় সমালোচনা উঁচুদরের। বইখানি বাংলা-ভাষার সমালোচনা-সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি কর তাতে সন্দেহ নেই। বাঁধাই ও ছাপা বেশ ভাল। দাম মোটে ২৷৷৹ টাকা।

শ্রীদর্শন শ

আদিশুর ও ভট্টনারায়ণ—বি এ তত্ত্বনিধি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও অমরেশ্বর ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত—আদি ব্রাহ্ম-সমাজযন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকার দেশবিশ্রুত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, আদি ব্রাহ্ম-সমাজে সেক্রেটরি, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং নিজে প্রতিষ্ঠিত লেখক। ধর্ম্ম ও দর্শ সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছে কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব ও বিবাদাস্পদ ইতিবৃত্ত সম্পর্কে এই বোধহয় তাঁহার বিশিষ্ট উ ভট্টনারায়ণ ঠাকুর-বংশের আদিমতম পূর্ব্ব পুরুষ। জনশ্রুতি এই যে, আদি নামক গৌড়াধিপ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনা তাঁহাদিগের অন্যতম এবং হয়ত মুখ্যতম। কোন কোন ঐতিহাসিক গবেষণা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের এবং সঙ্গে আদিশূরের ঐতিহাসিকতা উড়াইয়া দিয়াছেন। এ

উদ্দেশ্য সেই প্রত্যাখ্যাত ঐতিহাসিকতা পুনঃস্থাপন করা। ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাঙ্গালী জাতির অতীত কাহিনীর জন্য গৌরব অনুভব করেন এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করেন—সেই জন্যই তাঁহার এই প্রয়াস। সে প্রসঙ্গে তাঁহাকে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং বহু প্রমাণ প্রয়োগের অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে হইয়াছে—গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গীয় ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায়ে হয়ত' নূতন আলোকপাত হইবে।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন মুদ্রা বা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। যেখানে ঐরূপ সমসাময়িক সাক্ষ্য বিদ্যমান, সেখানে ব্যক্তি বিশেষের ঐতিহাসিকতা লইয়া বাদ বিবাদ করিতে হয় না। কিন্তু ঐরূপ সাক্ষ্যের অভাবকে নাস্তিত্বের চরম প্রমাণ মনে করা সঙ্গত কি? ঐরূপ argumentum ab silentio বিজ্ঞ ব্যক্তির বরণীয় হওয়া উচিত নহে। আলোচ্য আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে বহু কুল-পঞ্জিকা ও ঘটককারিকা রহিয়াছে—তাহারা মূলতঃ কিংবদন্তীমূলক হইলেও, পুরুষানুক্রমে লিখিত ও বংশ পরম্পরায় প্রচলিত সকল প্রাচীন বংশকারিকা অবজ্ঞা সহকারে উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণের স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগের এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে আনীত অপর চারি জন ব্রাহ্মণের বিবরণ সঙ্কলনে ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে প্রধানতঃ ঐ সকল কুলপঞ্জিকার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, গ্রন্থকার ঐ সকল গ্রন্থের কাল-নির্ণয় করিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য ও আপেক্ষিক প্রামাণিকতার নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু মূল গ্রন্থ দেখিবার যে তাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। অনেক স্থলেই তাঁহাকে পরের মুখে ঝাল খাইতে হইয়াছে। আশা করি আগামী সংস্করণে তিনি এ বিষয়ে প্রণিধান করিবেন।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ কবে বাংলায় আসেন? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ক্ষিতীশ-বংশাবলীর মতে ৯৯৯ সম্বতে (নবনবত্যধিক নবশতশতাব্দে), কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে ৬৫৪ সম্বতে (বেদবাণাঙ্কশাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ), ভূমিকা লেখক ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে ৭৭৯—৮২ খৃষ্টাব্দে এবং ক্ষিতীন্দ্রবাবুর নিজের মতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দে। ক্ষিতীশ-বংশাবলীর রচনাকাল কি এবং উহার প্রামাণিকতা কতদূর? কুলগ্রন্থের কোনখানি প্রাচীনতম ও প্রামাণিকতম? বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম গ্রন্থের বয়ঃক্রম কত? ঐ বাচস্পতিই কি প্রসিদ্ধ 'ভামতী' প্রণেতা 'ষড়্‌দর্শন ধুরীণ' বাচস্পতি মিশ্র? ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা দেখিলে আমরা প্রীত হইতাম। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণই কি 'বেণীসংহার নাটককার ভট্টনারায়ণ? তাহা যদি হয়, তবে ঐ নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি নিজকে 'মৃগরাজলক্ষণ' বলিলেন কেন? তদিদং কবে মৃগরাজলক্ষ্মণঃ ভট্টনারায়ণস্য কৃতিঃ বেণীসংহারং নাম নাটকং প্রযোক্তুম্ উদ্যতা বয়ম্। ঐ স্থানে 'মৃগরাজ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বেণীসংহার হইতে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'দশ রূপকে' এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'তে বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। সেই জন্য A. A. Macdonell বলেন—Though his date

cannot be fixed with certainty, the dramatist Bh[a]narayana must have lived before 800 A. D। আলোচ্য ভট্টনা[রায়ণ ও] বেণীসংহারের ভট্টনারায়ণ অভিন্ন হইলে, বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের ক্ষিতীন্দ্রবাবুর নির্দ্দি[ষ্ট কাল] বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সত্য বটে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, বেণীসংহার[ের] ভট্টনারায়ণ পূর্ব্বে কনৌজে ছিলেন, পরে কোন কারণ বশতঃ ৮০ বর্ষ বয়সে ব[ঙ্গে] আসিয়া বসতি করেন। কিন্তু ঘণ্টককারিকা ভিন্ন এ কথার প্রমাণ কি আছে? ... এক কথা। বঙ্গে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন শ্রীহর্ষ। তাঁহার প্রসিদ্ধ নৈষ[ধ] মহাকাব্য ২২ সর্গে সম্পূর্ণ—ঐ কাব্যের প্রতি স্বর্গের অন্তিম শ্লোকে তিনি নিজ পিতা[মাতার] উল্লেখ করিয়া কিছু কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার পিতা শ্রীহীর, মাতা মামল্ল[দেবী]। শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালং কারহীরঃ সুতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্ল[দেবী] চ যম্। (ঘটকারিকায় কেহ কি এই মাতাপিতার নাম কোথাও পাইয়াছেন?)। ... সকল শ্লোক হইতে জানা যায় 'নৈষধচরিত' ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ... যথা খণ্ডনখাদ্য, অর্ণব বর্ণন, ছিন্দ প্রশস্তি, বিজয় প্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি, স্থৈর্য্য বি[চার] প্রকরণ ইত্যাদি। নৈষধের শেষ সর্গে শ্রীহর্ষ সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন যে কান্যকুব্জ[েশ্বর] তাঁহাকে সমাদর করিয়া তাম্বুলদ্বয় ও আসন প্রদান করিয়াছিলে—

তাম্বুলদ্বয় আসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জে শ্বরাৎ

ঐ অবসরে তাঁহার গৌড়াগমনের কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু তাহার উল্লেখ না[ই]। তবে এক শ্লোকে একটু ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে—তিনি যে সকল প্রশস্তি রচনা করিয়াছি[লেন] তাহাদের অন্যতম 'গৌড়োর্ব্বীশ কুল প্রশস্তি ভণিতি' (সপ্তম সর্গের শেষ শ্লোক দ্রষ্ট[ব্য])। আশা করি প্রাত্নতাত্ত্বিকেরা এ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করিবেন। ঐ গৌড়াধিপের প্র[শস্তি] রচনা কি শ্রীহর্ষের বঙ্গে উপনিবেশের ফল।

আদিশূর সম্বন্ধে ক্ষিতীন্দ্র বাবু অনেক আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার বিষ[য়ে] প্রচুর মতভেদ। আইন্ আকবরিতে আদিশূর ও তাঁহার বংশীয় ৮ জন রাজার উ[ল্লেখ] আছে। কিন্তু ঐ উল্লেখ মাত্র কিংবদন্তীকে ভিত্তি করিয়া। কয়েকজন ঐতিহাসি[কের] মতে আদিশূর ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা হন। অপরে তাঁহার ঐতিহাসিক[ত্ব] স্বীকার করেন না। এইরূপ তাঁহার কাল লইয়া, জাতি লইয়া রাজধানী প্রভৃতি লই[য়া] অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। আমি আশা করি ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সযত্ন সংকলিত ... গ্রন্থ দ্বারা ঐ সকল বিবাদাস্পদ বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা হইবে এবং যে উদ্দে[শ্যে] তিনি এত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনা[থ] ...

---

1. **World Revolution and the U. S. S. R.—**
By M. T. Florinsky, Ph. D., (Macmillan & Co.)
2. **Problems of a Socialist Government—**
By Sir Stafford Cripps & Others, (Gollancz)
3. **Problems of Peace.**
By G. P. Gooch & Others ; (George Allen & Unwin Ltd.)

জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধিয়াছে; প্রত্যেক জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ও আনুষঙ্গিক অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে; ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সাজ সাজ রব উঠিয়াছে; বিষাক্ত গ্যাসের আবহাওয়ার মধ্যে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে তাহা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের যুদ্ধনিবারণী ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে; এমন অবস্থায় এই যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধ বাধিল, এমন একটা আশঙ্কা যদি বৃদ্ধি পায় তবে সেটা খুব অস্বাভাবিক নহে। তবে বিপদ এই যে এই প্রকার আশঙ্কামূলক মনোভাব হইতেই অনেক সময়ে যুদ্ধ বাধিয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মাদ্রাজী জ্যোতিষীরা, অন্য প্রান্ত হইতে হিন্দী ও উর্দ্দু পঞ্জিকাকারেরা ঘোষণা করিতেছেন যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ অনেকটা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মতন, সুতরাং যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। এরূপ সময়ে আন্তর্জাতিক ও জাতিবিশেষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য এদেশের শিক্ষিত লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়াছে। উল্লিখিত তিনখানি বই পড়িয়া এই কৌতূহল কতকটা নিবৃত্ত হইবে; উপরন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জটিল সমস্যার সমাধানের উপর বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অনেকে মনে করেন যে রাশিয়া যুদ্ধ বাধাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আছে; এক হাতে মার্কস-এঞ্জেল-লেনিনের নবসংহিতা অন্য হাতে গোলাবারুদ লইয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র বুঝি জয়যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ১৯১৮ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুগের সোভিয়েট রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা করিয়া Florinsky দেখাইয়াছেন যে উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনের পর প্রথম দুই বৎসর কাল (১৯১৮-২০) অবশ্য রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ সমগ্র পৃথিবীতে—বিশেষতঃ ধনিকতন্ত্রী দেশগুলিতে বিপ্লব-বাধানো প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। বলশেভিকদের মধ্যে চরমপন্থী (Left Wing) দল ভাবিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রে কম্যুনিজম্ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে অন্যান্য ধনিকপ্রধান রাষ্ট্র উহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে। একদিকে মার্কস্ ও এঞ্জেলের মতবাদ, অন্যদিকে তৎকালীন ঘটনা এই আশঙ্কার অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছিল। তজ্জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যখন Third Internationalএর অধিবেশন হইল, তখন তাহার প্রধান কার্য্য হইল পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের বাণী প্রচার করা—দেশে দেশে শ্রেণীবিরোধকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়া অন্তর্বিপ্লব সংঘটন করা। Zinoviev এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। Third Internationalএর সহিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ; উহার দ্বিতীয় কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে যতদিন পর্য্যন্ত না পৃথিবীর সর্ব্বত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়া রাশিয়ার সোভিয়েটের সহিত যুক্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত বিত্তহীনগণ অসি কোষবদ্ধ করিবে না।

Florinsky তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে লেনিন সমগ্র জগতে বিপ্লব সং বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই সহকারী—ট্রট্স্কি ও ষ্ট্যালিনের মধ্যে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইল। ট্রট্স্কি মার্কসের অবলম্বন করিয়া দেখাইলেন যে কেবল মাত্র একটি দেশে কখনও কম্যুনিষ্ট বিপ্লব হইতে পারে না—সকল দেশে উহা প্রচার ও স্থাপন করিবার চেষ্টা করা উচিত। আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিন্তু এরূপ শোচনীয় ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল যে বাহিরে ঘটাইবার দিকে মন দিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধনউৎপাদন সমস্যা সমাধানে ঘটিবে। তাই ষ্ট্যালিন্ World Revolution-এর ধূয়া ছাড়িয়া "Socialism single country"—অর্থাৎ আগে রাশিয়াতেই কম্যানিজম্‌কে পূর্ণগৌরবে করা হউক, পরে অন্য দেশের কথা ভাবা যাইবে—এই নীতির সমর্থন করিলেন। যুদ্ধে ট্রট্স্কির পরাজয় ঘটিল; একে একে তিনি তাঁহার সমস্ত অধিকার ও পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন; অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তুরস্ক দেশে আশ্রয় লইলেন। সময় হইতে রাশিয়া স্বীয় উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কার্য্যে ধনিকতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন। সেইজন্য সোভিয়েট বিশ্বশান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার প্র M. Litvinov বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের Preparatory Commission on armamentএ "immediate, complete, and general disarmament" সকল দেশে আশু সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ দাবী করিলেন। বলশেভিক বিপ্লবের দশ মধ্যে রাশিয়া রণনীতির পরিবর্ত্তে বিশ্বশান্তির উপাসক হইল। Florinsky দেখাই যে ইহার পর কেমন করিয়া আজ পর্য্যন্ত (১৯৩৩, ৪ঠা জুলাই) রাশিয়া বিভিন্ন সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছে। রাশিয়া শান্তি স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছে, মুসোলিনি ও হিট্লারের সহিতও বন্ধুত্ব করিয়াছে, এ সংবাদ বিশ্বশান্তির দিক খুবই আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু গত শতাব্দীর রাশিয়ার ইতিহাসে আমরা দেখি যে ওয়াটর্লুর যুদ্ধের পর জার প্রথম অ্যালেকজ্যাণ্ডার বিশ্বশান্তি স্থাপনে উদ্যোগী Holy Alliance প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ গিয়াছিল; আবার গত শতাব্দীর শেষভাগে জার দ্বিতীয় নিকোলাস্ বিশ্বশান্তি স্থাপনে রাষ্ট্র সমূহকে নিরস্ত্রীকরণে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহার কিছুদিন পরেই যুদ্ধ উঠিয়াছিল। সেইজন্য রাশিয়ার এই আধুনিক প্রচেষ্টা কতটা সফল হইবে সে মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে।

Problems of a Socialist Government বইখানি ইংলণ্ডের শ্রমিক চরমপন্থীগণের ভবিষ্যৎ নীতির নির্দ্দেশ সূচনা করিতেছে। ইঁহারা স্থির করিয়াছেন ইঁহাদের হাতে ক্ষমতা আসিবা মাত্র ইঁহারা সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন। র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া নেতার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ইঁহারা জন-সাধারণকে সমাজতন্ত্রবাদী করিয়া নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভের আশা ও নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) পন্থায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ মনে করেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইঁহারা House of Lordsকে ধ্বংস Administrative Law দ্বারা রাজ্য শাসন করিবেন, ও কোন নিয়ম আইন এই প্রশ্ন করিবার অধিকার হইতে বিচারালয়কে বঞ্চিত করিবেন; House of

Commonsএর হাতে কেবলমাত্র মূল নীতি গঠনের ক্ষমতা রাখিয়া সমস্ত কার্য্যের ভার বিভিন্ন কমিটির হাতে দিবেন। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিকতা যে কিরূপে বজায় থাকিবে তাহা বুঝা কঠিন। আবার ইঁহারা যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহাতে প্রথমে সম্পত্তির মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে ও কয়েকটি মাত্র ধনউৎপাদক যন্ত্র, কারখানা, প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনা হইবে। এরূপ রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক বলিতে রাশিয়ানগণ অন্ততঃ রাজী হইবেন না। যাহা হউক আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি যে ইংলণ্ডে যদি শ্রমিক দল কোন প্রকার সমাজতন্ত্র স্থাপন করিতে চাহেন, তবে ধনিক দল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিবে ও তাহার ফলে বিশ্বশান্তির বিঘ্ন ঘটিবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই দলের মত এইরূপ—"A Socialist Government would have to cut the knot (ভারতের সাম্প্রদায়িকতার) by the immediate placing of responsibility on the Indians themselves. It would not conern itself overmuch with the "constitutional" claims of princes. It would......concentrate on safeguarding, so far as it could, the position of the great mass of Indians—peasants and industrial workers. Those Socialists who suggest that it is necessary for us to stay in India in order to do this must face the fact that we can only now stay in India at all (in a position of control, that is) by the use of military force, repression, martial law, etc. Only as a fellow working-class movement can we effectively assist our Indian fellow-workers in their own struggle for emancipation. Most certainly we cannot do it as an alien army of occupation"। এই আশ্বাসবাণীতে আশা করি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা আশ্বস্ত হইয়া পথ চাহিয়া ও কাল গুণিয়া বসিয়া থাকিবেন।

Problems of Peace বইখানি The Geneva Institute of International Relationsএ প্রদত্ত বক্তৃতার সমষ্টি। ইহাতে জেনেভার Graduate Institute of International Studiesএর Director Mr. William Rappard স্বীকার করিয়াছেন যে সুদূর প্রাচ্যে (চীন-জাপান) শান্তি রক্ষার, নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ অকৃতকার্য্য হইয়াছে; সুতরাং লীগ্ অফ্ নেশনসের "Political vitality is to-day at a low ebb" কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Gooch সাহেব গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে বর্ত্তমানের অর্থ-নৈতিক দুর্গতি বিশ্বের সমগ্র জাতির মধ্যে অর্থ-নৈতিক ঐক্য আনয়ন করিতে পারে—"As the League was the child of the war, the only less terrible experience of the economic blizzard seems likely to produce a further advance towards the rationalization of our corporate life"। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় লিখিয়াছেন বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় দর্শনবিদ্ C. Delisle Burns। তিনি বলেন যে অর্থনৈতিক ঐক্য আনয়নের একমাত্র উপায় জগতের জনসাধারণের ব্যবহার-

উপযোগী দ্রব্য সম্ভারের জোগান দেওয়া। এই কার্য্যে উৎপাদকের লাভের না তাকাইয়া দরিদ্রের অভাবমোচনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। Produ... এর দিক্ হইতে অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—মাল বিক্রয়ের খুঁজিবার জন্য মারামারি কাটাকাটি না করিয়া দরিদ্রদের খরিদ্দ করিবার শক্তি বাজার তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে দেশের অর্থ-নৈতিক স্বতন্ত্রতা গঠনের আদর্শকে ত্যাগ করিয়া মহামানবের অর্থনীতিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবকে গঠন ও ... করিতে পারিলে যুদ্ধের আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। জগতের শান্তিকামী ... ব্যক্তিকে এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে ও শান্তির ... আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। এই গুরুতর দায়িত্বসম্পাদনের উপর ... নির্ভর করিতেছে।

শ্রীবিমানবিহারী ম...

The Name and Nature of Poetry—By A. E. Housm... (Cambridge University Press).

Form in Modern Poetry—By Herbert Read, (Sh... and Ward).

হাউসম্যান এর জন্ম ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স সত্তর ... হইয়া গিয়াছে। অথচ কার্য্য হিসাবে ইঁহার খ্যাতির ভিত্তি মাত্র দুখানি কবিতা... যাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ একশত চারিটি গীতিকবিতা সঙ্কলিত আছে। তিনি যে কিরূপ ... লেখক তাহা বুঝিতে পারা যায় যখন মনে পড়ে যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ—এ শ্রপ্‌সায়ার ... প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ, আর দ্বিতীয় গ্রন্থ—লাষ্ট্‌পোয়েম্‌স্ ১৯২২-এ। কবিপ্রতিভা ... গ্রন্থের বিপুলতার বা তালিকা দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না বলিয়াই ইংরাজী ... হাউসম্যানের স্থান অবিসংবাদিত। বাহুল্যবর্জ্জনের এ হেন উদাহরণ যে-কোন ... বিরল। এমন একটি লাইনও তাঁহার কবিতায় খুঁজিয়া মেলেনা যাহা শিল্পীর অখণ্ড ... সংযোগের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত। যতদিন কাব্যে ঘনীভূত আবেগের নিরলঙ্কার ... প্রকাশের আদর থাকিবে ততদিন এই কবিটিকে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হাউসম্যান শুধু কবি নহেন, অনন্যচিত্ত সাহিত্যসাধক। তিনি কেম... ল্যাটিন সাহিত্যের অধ্যাপক, ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভাষার শ্রেষ্ঠকীর্ত্তিগুলি তাঁহার ... মানসসঙ্গী। তাঁহার সাহিত্যসাধনার আদর্শ যে কিরূপ. অকুতোভয় ঊর্দ্ধমুখ ... নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে বোঝা যায়—

Orators and poets, sages and saints and heroes, if rare in comp... with blackberries, are commoner than returns of Halley's comet : ... critics are less common.

আজীবন সাধনার পর এই ধরণের লোক যখন কোন মতামত ব্যক্ত ... তখন সাহিত্যামোদী ছাত্র মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি আকারে ছোট, পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, ১৯৩৩এর ৯ই মে তারিখে কেম্‌ব্রিজে প্রদত্ত লেস্‌লি ষ্টীফন্ বক্তৃতার মুদ্রিত লিপি মাত্র। হঠাৎ অবাক লাগে, এইটুকু বইয়ের এ বিশাল ও দাম্ভিক নামকরণ হাউসম্যানের মতো সংযতবাক্ লোকের পক্ষে সম্ভব হইল কেমন করিয়া; তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে কেমন করিয়া ভোলা সম্ভব হইল যে পৃথিবীর যাবতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থগুলি একত্র করিলে ব্যাপারটা হইয়া উঠিবে, যেন "পেলিয়ন-এর উপর ওসা চাপানো"। তাহাদেরও ত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কবিতার নামরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা ছাড়া; অথচ সে সমস্যা আজও অমীমাংসিত্ রহিয়াছে। বইটি শেষ করার পর একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় এ নামকরণে অবিনয়ের স্পর্দ্ধা নাই, বাক্‌সংযমের চেতনা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। হাউসম্যান ভালো করিয়াই জানেন তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব, যিনি যাহাই বলুন না কেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত মতের অতিরিক্ত কিছুই নহে। কাজেই কাহারো কিছু বলিবার থাকিলে যথাসাধ্য সংক্ষেপে ও শৃঙ্খলায় যে এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা সারা যায়, হাউসম্যানের বক্তৃতাটি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই বক্তৃতার সূচনামুখে হাউসম্যান বলিতেছেন তাঁহার প্রথম ইচ্ছা ছিল কাব্য-প্রকৃতির পরিবর্তে আলোচনা করা ছন্দপ্রকৃতির, যে বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব কিছু বলিবার আছে, ও যে বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় কভেন্টি, প্যাটমোর ও ফ্রেড্‌রিক মায়ার্স ব্যতীত অন্য কেহ বিশেষ কোন মৌলিক গবেষণা করেন নাই। শ্রোতৃবর্গের অধৈর্য্যের ভয়ে তিনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। আমাদের দেশেও সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছন্দ লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গেল, অভব্য কটুক্কাটব্যও বাদ পড়ে নাই, যদিও মূলগত গুরুতর বিষয়গুলি যে বিশেষ পরিষ্কার হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ছন্দালোচনা বলিতে হাউসম্যান কি বোঝেন—অবশ্য ইংরাজী ছন্দ সম্বন্ধে—তাহা তুলিয়া দেওয়া গেল:

I mean such matters as these : the existence in some metres, not in others, of an inherent alternation of stresses, stronger and weaker ; the presence in verse of silent and invisible feet, like rests in music ; the reason why some lines of different length will combine harmoniously while others can only be so combined by great skill or good luck ; why, while blank verse can be written in lines of ten or six syllables, a series of octosyllables ceases to be verse if they are not rhymed ; how Coleridge, in applying the new principle which he announced in the preface to Christabel, has fallen between two stools : the necessary limit to inversion of stress, which Milton understood and Bridges overstepped ; why, of two pairs of rhymes, equally correct and both consisting of the same vowels and consonants, one is richer to the mental ear and the other poorer ; the office of alliteration in verse, and how its definition must be narrowed if it is to be something which can perform that office and not fail of its effect or actually defeat its purpose.

এই সুচিন্তিত মন্তব্যগুলি দিয়া হাউসম্যান আমাদের মনে যে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিয়াছেন, আশা করা যাক, অবিলম্বে প্রকাশিতব্য কোন পুস্তকে তিনি তাহা তৃপ্ত করিবার আয়োজন করিতেছেন। কারণ, তাঁহার তুল্য ছন্দকুশলী কবি ইংরাজী সাহিত্যেও

বিরল। অনেকের ধারণা, শেলি বা সুইনবার্ণের মতো নবছন্দের প্রবর্তন ভিন্ন কৌশলের পরিচয় দেওয়ার অন্য উপায় নাই। তাঁহাদের চোখেই পড়ে না, অতিপ্রচলিত ছন্দ ব্যবহারের অন্তরালে কি অসাধারণ প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ও ধ্বনি আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, হাউসম্যানের ছন্দ-নৈপুণ্য শ্রেণীর। তাঁহার শব্দচয়নের মতো তাঁহার ছন্দ-চালনেও কোনরূপ আড়ম্বর বা শয্যের আভাসও তিনি সযত্নে পরিহার করিয়াছেন।

কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে হাউসম্যানের মূলসূত্র এই যে কবিতার কাজ চিন্তা নয়, ভাব সংক্রমণ—

I think that to transfuse emotion—not to transmit thought but to up in the reader's sense a vibration corresponding to what was felt by writer—is the peculiar function of poetry.

এই সূত্রানুযায়ী বিচার করিয়া ড্রাইডেন, পোপ, ইত্যাদির রচনাকে কবিতা তিনি নারাজ। ইঁহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রতি তিনি অন্ধ নহেন; তিনি এইসব লেখককে কবি বলিয়া প্রমাণিত করিতে বর্ত্তমান ইংলণ্ডে প্রবল চেষ্টা চলি তিনি ইহাও মানেন ইংলণ্ডের উনিশ শতক তাহার আঠারো শতকের সম্বন্ধে সুবিচার করে নাই; তবুও তাঁহার মতে—

It set a low value on the poetry of the eighteenth century, not because it differed in kind from its own, but because, even at its best, it differed quality, as its own best poetry did not differ, from the poetry of all the ages, whether modern or ancient, English or foreign, which acknowledged as the great ages of poetry. Tried by that standard the poetry of the eighteenth century, even when not vicious, even when sound good, fell short.

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে হাউসম্যানের এই মূল সূত্রটির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা যাইতে পারে। নিজচিত্তই স্বভাবতঃ অর্দ্ধস্পষ্ট, পরচিত্ত অন্ধকার কাজেই কি করিয়া বুঝিব একটা কবিতা পড়িয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে রচনাকালে কবির মনেও ঠিক সেই ভাবটিই ফুটিয়াছিল। একই কবিতা বিভিন্ন পাঠকের মনে কত অসম্ভব রকমের বিভিন্ন প্রতিঘাত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা ভাবিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। কেম্ব্রিজেরই অন্যতম অধ্যাপক, আই, এ, রিচার্ডস কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা লইয়া যে শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষণ পরিচালনা করিয়াছিলেন, কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী তাঁহার "প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম্" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করে, এ সম্বন্ধে হাউসম্যানের বলিবার কি আছে। এমন কোন্ নিক পাথর আছে যাহার যোগে স্থির করা যাইবে, এই অসংখ্য অনুরণনের মধ্যে কোনটি অর্থাৎ কোনটি কবির অন্তরের স্পন্দনের অনুগামী? হাউসম্যানের তরফ হইতে দেওয়া যায় যে এই মতবিভেদে তাঁহার কিছু যায় আসে না। তিনি ত গোড়াতেই চুকিয়াছেন যে সাহিত্যে সকল মতই ব্যক্তিগত মত। যে রচনা পাঠে তাঁহার দৃঢ় হইবে যে তাঁহার ও কবির মধ্যে ভাবসংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার সত্য কবিতা।

এ উত্তরের পিছনেও যে আর একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, অধ্যাপক হাউসম্যানের ন্যায়নিষ্ঠ মন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলে নাই।

Am I capable of recognising poetry if I come across it? Do I possess the organ by which poetry is perceived?

হাউসম্যান কিন্তু এ ধরণের প্রশ্নবর্ষণ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন, উত্তর দেবার চেষ্টাও করেন নাই, বোধহয় এই বলিয়া যে এ প্রশ্নের উত্তরদাতা দুনিয়াতে আছেন মাত্র একজন যাঁহাকে মানুষ সর্ব্বজ্ঞ কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা পায়।

সে যাহা হউক, এই প্রবন্ধে তিনি এমন একটি উক্তি করিয়াছেন যাহা তাঁহার সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির নিঃসংশয় প্রকাশ। তিনি বলিতেছেন, নিছক কাব্যরসবোধ না থাকিলেও কবিতা পড়িয়া প্রভূত আনন্দলাভ করা অসম্ভব নয়। এমন কবিতা কদাচিৎ লেখা হয় যাহাতে বিশুদ্ধ কাব্যরস ভিন্ন অন্য কোনরূপ উপকরণ মিশানো নাই, এবং এই মিশ্রিত উপাদান উপভোগ করা একান্তই সহজ। তাঁহার মতে অধিকাংশ কবিতাপাঠকের আনন্দের উৎস এইখানেই। উদাহরণ হিসাবে দেখানো যায়, অনেক ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-ভক্তই তাঁহার কবিতাকে অযথা কারণে ভালবাসেন। তাঁহারা ভালবাসেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের দার্শনিক মতবাদকে, যাহা বলে বহিঃ-প্রকৃতি মানুষেরই মতো প্রাণবান্ অনুভূতিশীল ও মঙ্গলময়; কিন্তু ভুলিয়া যান, এ ধারণা গ্রীকদের দেবদেবী কল্পনার মতো অসার্থক।

ভক্তিরসাত্মক কবিতার রসবিচারও তাহার মতের সমর্থন করে।" বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসের প্রাচুর্য্য—গীতাঞ্জলির অনুকরণে ও প্রতিকরণে—অসুস্থ দেহস্ফীতির মতো দীপ্যমান। তাই হাউসম্যানের উক্তিটি সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া বোধহয় অন্যায় হইবে না।

I have been told by devout women that to them the most beautiful poetry is Keble's. Keble is a poet; there are things in the Christian Year which can be admired by atheists; but what devout women most prize in it, as Keble himself would have wished, is not its poetry; and I much doubt whether any of them, if asked to pick out the best poem in the book, would turn at once to the Second Sunday after Easter. Good religious poetry, whether in Keble or Dante or Job, is likely to be most justly appreciated and most discriminatingly relished by the undevout.

কবিতাপাঠের সময় হাউসম্যান তাহাতে খোঁজেন হৃদয়োত্থিত ভাবের দ্যোতনা; তাই কবিতার অর্থ, যাহা বুঝিতে হইলে বুদ্ধি পরিচালনার প্রয়োজন, তাঁহার নিকট গৌণ পদার্থ, এমন কি অনেক সময় রসবোধের অন্তরায়।

Tho' thou art worship'd by the names divine
Of Jesus and Jehovah, thou art still
The Son of Morn in weary Night's decline,
The lost traveller's dream under the hill.

ব্লেকের এই সুবিখ্যাত লাইন কটির উপর তাঁহার মন্তব্য এই; It purports to be theology; what theological sense, if any, it may have, I cannot imagine and feel no wish to learn. It is pure and self-

existent poetry, which leaves no room in me for anything besides। এই কারণে তাঁহার কাছে ব্লেক হইতেছেন কবি, দ্যোতনক্ষমতায় ব্লেক সকল কবি হইতে শ্রেষ্ঠ, ও শেকসপিয়ারের সমতুল্য। এমনকি ব্লেকের কবিতা শেকসপিয়ারের কবিতা অপেক্ষা বিশুদ্ধতর, কেননা, শেকসপিয়ারের কাব্যে চিন্তা, দার্শনিকতা, জীবনবেদ ইত্যাদি ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। শিল্পী হিসাবে তাই শেকসপিয়ার ব্লেকের অপেক্ষা পূর্ণতর, কিন্তু ব্লেকের রচনা নিছক অবিমিশ্র কাব্য।

Shakespeare is rich in thought, and his meaning has power of itself to move us, even if the poetry is not there. Blake's meaning is unimportant or virtually non-existent, so that we can listen with all our hearing to the celestial tune.

কবিতার এই দ্যোতনশক্তির ফলে আমাদের শরীর ইহাতে ঢের বেশী সাড়া দেয় আমাদের বুদ্ধির চাইতে। শরীর রোমাঞ্চিত হয়; দাড়ি কামাইতে গিয়া হঠাৎ সাবেগ কাব্যাংশ মনে পড়িলে, ক্ষুরের গতি স্তব্ধ হয়; মেরুদণ্ড বাহিয়া শিহরণ প্রবাহিত হয়; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া চোখ জলে ভরিয়া উঠে, বক্ষে ছুরিকাঘাতের মতো তীব্র অনুভূতি দেহের গভীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তোলে।

শরীর ও মনের কিরূপ অবস্থা কবিতা রচনার পক্ষে অনুকূল, তাহার এ উদাহরণ—কবিতাটির প্রথম অকস্মাৎ আবির্ভাব হইতে শেষ পরিমার্জ্জন পর্য্যন্ত—নি জীবন হইতে দিয়া হাউসম্যান তাঁহার বক্তৃতা-শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বীয় প অধ্যাপনাকক্ষে প্রবেশ করিলেন—সাহিত্যসমালোচনার বিপদসঙ্কুলক্ষেত্র হইতে চিরবি লইয়া farewell for ever।

হারবার্ট রীড ও হাউসম্যানের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও অধ্যাপক, এডিন শিল্পশাস্ত্রের। সাদৃশ্যের শেষ বোধহয় ওইখানেই। এই নবীন অধ্যাপকটি লেখনী-লাজুক নহেন। সৃজনী ও বিচার-সাহিত্যের নানা বিভাগে ইনি ক্ষমতার দিয়া সমসাময়িক পাঠকসমাজে আপন আসন দৃঢ় করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার শক্তি পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নাম পড়িয়া মনে হয় তাঁহার বিচার্য্য বিষয় আধুনিক ইংরাজী কবিতার গঠন-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক রীড সকুল যুগের সফল সকল কবিতা ধরিয়াছেন; ও 'ফর্ম্ম' কথাটির অর্থের মধ্যে প্রকৃতিকেও টানিয়া আনিয়াছেন। কাজেই বইটি হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্যের যাবতীয় জটিল প্রশ্নের গুরুভারে ভারাক্রান্ত। অথচ গ্রন্থকারের হাতে যথেষ্ট ছিল না যাহাতে এই সমস্ত প্রশ্নের যথোচিত বিচার চলিতে পারে। সুতরাং "রীজন্ এণ্ড রোমান্টিসিজম্" বা "ওয়াডস্‌ওয়ার্থ" বা "ফেজেজ অব ইংলিশ পোয়েট্রি" গ্রন্থে যে সুসংবদ্ধ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ইহাতে তাহা মেলে না। এখানে রচনাভঙ্গী সাহিত্যিকের উপযুক্ত না হইয়া, হইয়া উঠিয়াছে সংবাদিকের মতো; বিষয়ের অবতারণা করিয়া সস্তায় বিদায় দিয়াছেন, যেন দিনগত পাপক্ষয় করিলেই অন্যের মতামতের কোটেশন-বাহুল্য তাঁহার বিত্তাবত্তার বিস্তার সূচিত করিলেও যেন আত্মনির্ভরের অভাব জ্ঞাপন করে। তাই বলিয়া বইখানি সর্ব্বথা নিন্দনীয় জেরাল্ড ম্যানিলি হপকিন্স সম্বন্ধে (যাঁহার কবিতা লইয়া বর্ত্তমান ইংলণ্ডে প্রবল চলিতেছে) রীড তাঁহার বক্তব্য অল্পকথায় বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন। দীর্ঘ

কাহাকে বলে, অর্থাৎ কতখানি দীর্ঘ হইলে কবিতাকে দীর্ঘ নাম দেওয়া যায়—ইহার আলোচনাও বেশ চিত্তাকর্ষক। তবে বর্ত্তমান পুস্তকে রীড-এর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে তিনি সাহিত্য-আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। রীড বলেন, আজকালকার সাহিত্যবিচারে দুটি কথা অবশ্যপ্রয়োজনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা পাওয়া যায় না যাহাতে তাহারা ব্যবহৃত হয় নাই। সে কথা দুটি, ক্যারাকটার ও পার্সন্যালিটি। অথচ কোন সাহিত্যিকই কথা দুটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন না। কাজেই সমস্ত সাহিত্য-আলোচনা মূলতঃ থাকিয়া যায় অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, রীডের মতে, নব্যমনোবিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া উপায় নাই। তাই রীড ফ্রয়েড ইয়ুং ও তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি ও দুটি কথার ব্যাখ্যা করিতে চান ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সূত্রাবলীর সাহায্যে। রীড তাহাকেই বলেন পার্সন্যালিটি ফ্রয়েড যাহাকে বলেন ঈগো—

In every individual there is a coherent organisation of mental processes, which we call his ego.

আর রীডের মতে ক্যারাকটার তাহাই ফ্রয়েড যাহাকে "ইড্" বলেন—

That reserve of instincts and passions which we normally repress, but which are never securely under control of our conscious reason.

ক্যারাকটারের মূলে আছে এই inhibition, এই প্রতিরোধ।

Character is the result of an enduring psycho-physical disposition to inhibit instinctive impulses in accordance with a regulative principle.

এই প্রসঙ্গে গেটের উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে—

Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Ein Charakter im Strome der Welt.

প্রশ্ন জাগে ক্যারাকটারের এই regulative princeple এর সহিত পার্সন্যালিটির coherent organisation-এর তফাৎ কোথায়। রীডের উত্তর,—

The coherence of personality is indeed the coherence of a natural process; not the coherence of an arbitrary discipline. "It does not mean that one never changes, but that the changes of the world always find you ready to select your own point of view" (Ramon Fernandez).

ইহাকেই কীটস তাঁহার অধুনা সুবিখ্যাত পত্রে বলিয়াছেন—negative capability, নিজের বৈশিষ্ট্যের (ব্যক্তিত্বের নয়) বিলোপ করিয়া অন্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাময়িকভাবে একীভূত হইবার ক্ষমতা। রীডের মূল প্রতিপাদ্য এই:—

Character, in short, is an impersonal ideal which the individual selects and to which he sacrifices all other claims, especially those of the sentiments or emotions. It follows that character must be placed in opposition to personality, which is the general-common-denominator of our sentiments and emotions. That is, indeed, the opposition I want to emphasise and when I have said further that all poetry, in which I include all

lyrical impulses whatever, is the product of personality, and th inhibited in a character, I have stated the main theme of my essay.

মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় সাহিত্যসমস্যা সমাধানের এই প্রচেষ্টা বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সর্ব্বতোমুখী দিগ্বিজয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রীড একা এ পথের নহেন। মনে হয় ইংলণ্ডে রিচার্ডস্ ও এমেরিকায় ম্যাক্স্ ইষ্টম্যান ইঁহার বেশী অগ্রসর। ইহা সত্ত্বেও যখন রীডকে বলিতে শুনি—

Poetry is properly speaking a transcendental quality—a sudden formation which words assume under a particular influence—and we more define this quality than we can define a state of grace.

তখন মনে পড়িয়া যায় অন্ধকার অবৈজ্ঞানিক যুগের অলঙ্কারগ্রন্থ ধ্বন্যা উক্তি—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রা

No time like the Present—By Storm Jameson (Cass

আজকাল প্রণিধানযোগ্য গদ্যসাহিত্যের বিশেষত্ব, হচ্ছে আত্মজীবনক আধিক্য ও উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত অভাব। বর্ত্তমান যুগে যন্ত্রচালিত মানুষের চয়ন করবার বা শোনবার অবসর সময়ের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প থেকে হতে চলেছে—এটা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যে আত্মনিবেদনের নিজস্ব মূল্য আছে। দৈনন্দিন বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার অন্তরালে সচেতন ব্যক্তি সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং জীবনপথ হতে আহৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি পরম উপলব্ধিতে গ্রথিত করে ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় তাতে সমসাময়িক সুধী চিত্তরঞ্জন না হলেও সাহিত্যভাণ্ডার যে সমৃদ্ধিলাভ করে আলোচ্য বইখানি প্রমাণ।

শ্রীমতী জেমিসন আপন অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও জীবনের বৈচিত্র্যবিহীনতার সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও আত্মজীবনকাহিনী প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন কারণ তাঁর মতে আত্মনিবেদনই সত্যানুভূতি প্রকাশের একমাত্র উপায়। সমস্যার জটিলতায় উপন্যাসের গতি নিরুদ্ধকরণে রসবৈষম্য তো ঘটেই শিল্পী তার সৃষ্ট চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে আপন উপলব্ধির সীমা অতিক্রম করতে হয়। এটা জেমিসনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি। উপন্যাস রচনাকালে সুসীম নিশ্চয়তা তাঁর লিপিশক্তিকে উদ্বোধিত করেছে, অনতিকাল পরে সেই মুদ্রামূর্ত্তি গ্রহন করে তাঁর অজ্ঞতা ও প্রগলভতার স্থায়ী নিদর্শন হয়ে রইল, এতে দুঃখের অবধি নেই।

রসরাজ শ' বা অল্ডাস্ হাক্সলী অবশ্য সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে তথ্যবহুল সাহিত্যরচনা করেও পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছেন। কিন্তু সে সাহিত্যের প্রসাদগুণ সৃষ্টির সুসীমতায় নয়, স্রষ্টার অত্যদ্ভুত লিপিচাতুর্য্যে। সে সাহিত্য মনোরঞ্জন করে সত্য, কিন্তু মর্ম্ম স্পর্শ করে না। মানুষের হৃদয় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে সেই সূক্ষ্ম সাধারণ অনুভূতিগুলি যা ভাষা বা ভাবের পোষাকি আভিজাত্যে অবগুণ্ঠিত নয়, ক্রোধ বা দ্বেষের অতিশয্যে অতিরঞ্জিত নয়—যার প্রকাশ আত্ম-উৎসারিত, যার দ্যোতনা সমবেদনায় পরিপূর্ণ।

এ-কথা স্বীকার্য্য যে বস্তু-বিশ্বের জীব জীবনপথে বিক্ষিপ্ত বৃহত্তর সমস্যাগুলিকে অবহেলা করে সূক্ষ্ম অনুভূতির ভাবালুতায় আপন উপলব্ধি নিরুদ্ধ করতে পারে না। অশন ও বাসনের অনটন ও বণ্টনবৈষম্য অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অহর্নিশি যে অব্যক্ত বিদ্রোহের সৃষ্টি করে তার প্রভাব জীবনের অনুভূতিমাত্রকেই আচ্ছন্ন করতে বাধ্য।

আলোচ্য বইখানিতে অন্তরের এতাদৃশ চিরন্তন বেদনা ও প্রতিবাদস্পৃহাকে দমন করবার চেষ্টা হয়নি এবং সেই কারণে শেষ ভাগটি এতখানি তিক্ত হয়েছে, তবু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না তার কারণ আখ্যায়িকা আদ্যন্ত একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। আদর্শ পূর্ব্বেই বলেছি আত্মনিবেদন, অর্থাৎ আপন হৃদয়ের দ্বার অবারিত করে, ধাবমান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মানব মুসাফিরকে ক্ষণিক আত্মদর্শনে আমন্ত্রণ করা।

সুখের বিষয় বিষয়বুদ্ধি ও চেতনার তরঙ্গ এসে জীবন-বেলা আবিল করে দেবার পূর্ব্বে শৈশবকালের স্মৃতিটুকু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার বৈরিতায় ক্ষুণ্ণ হয় না। 'পথের-পাঁচালী'-প্রণেতা শৈশবকালের বিপুল আনন্দ, বিষাদ ও অসীম কৌতূহলের স্মৃতিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন বলে পরিণত বয়সে তা ভাষায় রূপান্তরিত করে আমাদের এতখানি আনন্দ দিতে পেরেছেন।

শ্রীমতী জেমিসন আলোচ্য বইখানির প্রথমভাগটি ভরিয়ে দিয়েছেন শৈশবকালের মধুর অনুভূতির ছন্দে ছন্দে; সে অনুভূতি যতখানি আনন্দে অনুপ্রাণিত ততখানি বিষাদে আচ্ছন্ন।

"I know that when I was a child my memory was single, one sight or sound could hold it all. Not far from our house there was a thicket hedge smothered in convolvulus. The big white funnel shaped flowers, much less beautiful than a hedgeful of wild rose or may, fascinated me. They died almost as you pulled them, and lay limp and gone. Only to stand looking at one gave me indescribable happiness and then to pull it and to hope, with what passion, that it would live. That single-minded absorption becomes rarer as we grow old".

কোন দেবতার স্পর্শ পেয়ে ঔপন্যাসিক জেমিসনের কবিত্বশক্তি মূর্ত্ত হয়েছে জানি না। যে অনুভূতির কথা বলেছি তা গদ্যে বর্ণিত কিন্তু সঙ্গীতের এমন সুস্পষ্ট ঝঙ্কার শুনতে পাই কথার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে মনে হয় ভাষা গৌণ, সার্থকতাও গৌণ, সত্য শুধু ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল অনুভূতিগুলি।

অবশ্য বয়ঃবৃদ্ধির জটিলতার আবিলতায় সে সঙ্গীত অস্পষ্ট হয়ে আসা অনি... প্রবর্দ্ধমান বালিকার স্বপ্ন-বিভোর জীবনে একে একে অলক্ষ্যে ভীড় করে প্রবেশ ক... বিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রী, সহপাঠী, জনসাধারণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ... আরও কত কি। ভাগ্য শুভ তাই ব্রীড়াবনতা স্বল্পভাষী ছাত্রী উচ্চশিক্ষার ... উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত সহচর লাভ করলে। এদের দুইজন শৈশবের সহপা... আর একজনের সহিত নূতন পরিচয়। কিন্তু শৈশবে একত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির ... মহিমা যে পরিণত বয়সে এই তিনটি যুবক সহপাঠীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় ... ছাত্রজীবন যাপন করতে উভয় পক্ষের কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ হল না।

স্ত্রীপুরুষভেদে ইংরাজ জাতি তাদের ব্যাবহারিক জীবনে অত্যন্ত-... কায়দাদুরস্ত বলে বিখ্যাত। বিস্মিত হতে হয় জেমিসনের ছাত্রীজীবনের এই ... দেখে। সংযম ও শালীনতার কথা স্বতন্ত্র—জেমিসন সে সময় অবার একটি ... প্রণয়মুগ্ধ সে কথা কাহারও অবিদিত ছিল না এবং সে জন্য নিষ্কণ্ঠচিত্ত সহানুভূতি ... সে সকলের কাছে। কিন্তু অভিভাবকগণের কি অনাবিল আস্থা! কত রজনী অতি... হয়েছে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চিমনীর স্তিমিত আলোকে, তর্কের মাঝে, গভীর ... অনুধাবনে—সে অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়েছে সম্পূর্ণ পক্ষপাতবর্জ্জিত ভাবে—... বিধিবদ্ধ লৌকিকতা সে সহজ সরল অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গতাকে কলুষিত করে নি।

স্বাধীনদেশের ছাত্রছাত্রী তারা—সংসারের যূপকাষ্ঠে কণ্ঠ তখনও অর্পণ ক... অভ্রভেদী বিপুল তাদের আশা। স্বেচ্ছাচার অনাচারের বিরুদ্ধে উচ্ছল উদ্ধ... নির্য্যাতিতের প্রতি অপার সমবেদনায় দেহমন প্লাবিত। এমন দিনে মহাযুদ্ধের ... এসে গ্রাস করে ফেললে একে একে সহচরদের, সহোদরকে। স্বপ্নাবিষ্ট যুবতী ... বিপর্য্যয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয়তাবোধের আকর্ষণ ও রক্তপ্রবাহের শীতল... তার প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মনে যে অব্যক্ত বিদ্রোহের সৃষ্টি করলে তার পরিসমাপ্তি ... অবসানেও হয়নি। সমাপ্তিহীন জ্বালাময় প্রদাহ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ ... বিচ্ছুরিত হয়ে মজ্জায় মজ্জায় অস্থিতে অস্থিতে তিক্ততা সঞ্চার করে এসেছে ... এবং এই তিক্ততার তীব্রতা অলোচ্য বইখানির শেষভাগে দুঃসহ করে ... পাঠকের ধৈর্য্যকে।

জেমিসন পরবর্ত্তী দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বামীপুত্রের ... উল্লেখ পর্য্যন্ত করেননি। বলেছেন, দৈনন্দিন মান অভিমানের পালা, খণ্ড খণ্ড ... ও নিরানন্দের বর্ণনা পাঠকের নিকট কোন অর্থপূর্ণ বারতা বহন করে নিয়ে যাবে ... তাঁর অর্থপূর্ণ জীবনের চরম পরিসমাপ্তি হয়েছে ১৯১৪ সালে। প্রসঙ্গক্রমে ... প্রণয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ জীবন তখনও আনন্দ-উৎসারণে মহিমময়, ... গতানুগতিকের মসীলিপ্ত অবগুণ্ঠন তখনও জীবনীশক্তির সক্রিয় পরিস্পন্দন ... করে নি।

শ্রীমতী জেমিসন এইখানে পরিসমাপ্তির ছেদ কেটে আখ্যায়িকা শেষ ... মনে মনে অস্বস্তি থেকে যেত—হয়তো তাঁর পরিশীলনশক্তি জগতের উদগ্র ... সম্মুখে কুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর পরিণত 'আমি'কে অধিকতর সূক্ষ্ম ও ... বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বের সৃষ্ট অপ্রীতিকর অতিকায় সমস্যা ...

অনুশীলন করেছেন নৈতিক ভাষার সাহায্যে—বিধিবদ্ধ প্রথায়; এবং শুনেছি তাঁর চিন্তার গভীরতা ও বুদ্ধির দীপ্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতসভায় ইতিপূর্ব্বেই প্রশংসিত হয়েছে।

আমি অন্য কারণে আকৃষ্ট হয়েছি। আমার মনে হয় ভাষার অতিরিক্ত যে গুণ অন্তরের প্রতীতিকে এইরূপ উজ্জ্বল ভাবে বহিঃপ্রকাশ করেছে তা সত্যনিষ্ঠারও অতিরিক্ত কিছু—যা কোন পুরুষের লেখনী হতে নিঃসৃত হতো না। অথচ মাতৃত্বের প্রভাব বলতেও সঙ্কুচিত হচ্ছি।

পাশ্চাত্য চিন্তাজগৎ নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা নিয়ে আজ বিব্রত। সুসভ্য জীবের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান অত্যন্ত প্রার্থনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীমতী জেমিসন আর একটি সমস্যা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করেছেন যা অধিক গুরুতর ভাবে প্রাণিধান-যোগ্য মনে করি। যন্ত্রযুগের প্রবর্ত্তনার পর হতে মানুষের বহির্জীবন অন্তর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আজ সেই ব্যবধানের বিস্তৃতি এত গভীর হয়ে পড়েছে যে ভয় হয় অচিরে সাবধান না হলে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা বুঝি থাকবেনা। অর্থাৎ যন্ত্রের ধাবমান রথে অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা করে সুসভ্য মানব আপন মৌলিকতা হারিয়ে অবসরটুকুও সময়ের বাঁধা খাতায় লিখিয়ে ফেলেছে এবং ফলে সাধারণ মানুষ অজানিত অস্বচ্ছন্দতায় পীড়িত হয়ে দিশাহারা ভাবে নিমজ্জিত হচ্ছে গতানুগতিকের আবর্ত্তে। এবং এই বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যক্ষেত্র আচ্ছন্ন করেছে শোচনীয় ভাবে। প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় উদ্ভাবন শ্রীমতী জেমিসন করেননি, কারণ সমস্যার অনুধাবনা আত্ম-নিবেদন নয়।

সার্থকতার কথা বিচার করে দেখলে মনে হয়, লেখিকার মূল উদ্দেশ্য যাই হোক হৃদয়াবেগের এই উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সাহিত্য-ইতিহাসে চিরকালের মত চিত্রার্পিত হয়ে থাকবে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

An Idealist View of Life—by S. Radhakrishnan (George Allen & Unwin)

Religion in the East & West—by S. Radhakrishnan (George Allen & Unwin)

Counter Attack from the East—by C. E. M. Joad (George Allen & Unwin)

Some Turns of Thought in Modern Philosophy—by George Santayana (Cambridge)

সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই মানুষ ভাবিতে সুরু করিয়াছে জীবনের অর্থ কি? কেন এবং কোথায় তাহার সূচনা, কিসে তাহার সার্থকতা? দিনের পর দিন, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ দিয়াই যদি জীবনকে বিচার করিতে চাই, তাহা হইলেও তো চলে না, কারণ ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ সকল সময়ে ধরা পড়ে কই? ধরা পড়িলেই বা তাহাতে কি লাভ? কেবলমাত্র "হইয়াছে" ইহা দিয়া কি হওয়ার "সার্থকতা" বিচার চলে?

অথচ সার্থকতার প্রশ্ন না তুলিয়াও তো আমরা পারি না। হয়তো এই সার্থকতার প্রশ্ন তোলে বলিয়াই সকল জীবশ্রেণী হইতে মানুষ স্বতন্ত্র।

সার্থকতার প্রশ্ন তুলিলেই আমরা কেবলমাত্র ঘটনা বা অস্তিত্বের গণ্ডী পার হইয়া যাই। কারণ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিয়াছে—অস্তিত্বের দিক হইতে তাহার বিষয়ে আর কিছুই বলিবার নাই। অস্তিত্বের মাপকাঠিতে তাই ভালো-মন্দের বিচারের কোন কথাই উঠে না—সেদিক দিয়া সার্থকতা অসার্থকতার কোন অর্থই নাই। ভালো মন্দ সার্থক অসার্থক প্রভৃতির বিচার কেবল তখনই ওঠে যখন কেবলমাত্র অস্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া আমরা তাহার মূল্য বিচার করিতে বসি, কিন্তু মাপকাঠি বা আদর্শ না থাকিলে মূল্য বিচার হইবে কি দিয়া? কাজেই মূল্য বিচারের অর্থ এই যে অস্তিত্ব ব্যতীত ঘটনা বা বস্তুর অন্য একটি দিক আছে, সেদিকের সংজ্ঞা দিতে পারি বা নাই পারি তাহার সত্য অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই।

মানব-জীবনের অর্থ বিচার করিতে বসিলেই তাই প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়া নেওয়া হয় যে অস্তিত্ব ভিন্ন তাহার অন্য লক্ষণ বা গুণ আছে। সেই লক্ষণ বা গুণ যে কি তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে,—চিরদিন চলিয়া আসিয়াছেও, কিন্তু সমস্ত মতভেদ সত্ত্বেও তাহার সত্তাকে কোন দিন অস্বীকার করা হয় নাই। জীবনের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করিনা কেন,—সমস্ত বিদ্রোহ সমস্ত প্রতিবাদের মূলে রহিয়াছে জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি। যে আদর্শ আমরা আমাদের বুদ্ধির আলোকে আশার রঙে ফুটাইয়া তুলি, সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে বলিয়াই তো বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধে আমাদের এত অভিযোগ। জীবনের অতি বড় নাস্তিকও তাই জীবনের সার্থকতাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে না—তাহার সমস্ত নাস্তিবাদের মূলে রহিয়াছে আশাআশঙ্কায় কণ্টকিত জীবনের পূর্ণতার আদর্শ।

একটি কথা মানুষ বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছে। জীবনের সার্থকতা যেখানে যাহাই হোক না কেন, পৃথিবীর দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহার পরিচয় মেলেনা। এখানকার অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার, রোগ-মারী-দুর্ভিক্ষ, ভাগ্যের পরিহাস আমরা বিশ্বাসের বলে স্বীকার করিয়া লইতে পারি, বলিতে পারি যে অদৃশ্যে বসিয়া মহাকাল যে মায়ার জাল বুনিতেছে, এ সমস্ত তাহারই প্রকাশ, ইহাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তাহাদের ব্যাবহারিক সত্য অস্বীকার করিবার উপায় কি? স্বর্গের স্বপ্নে আমরা পৃথিবীর বাস্তবকে ভুলিতে পারি, কিন্তু সে কেবলমাত্র পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া—পৃথিবীর ব্যাবহারিক সীমার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

সমস্ত বিবাদও বাধে এই প্রশ্নটিকে লইয়া। ব্যাবহারিক ছাড়াও কি কোন সত্য আছে? আর যদিই বা থাকে তবে আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধই বা কি? বুদ্ধির প্রাধান্য আমরা যদি স্বীকার করিয়া লই, বিজ্ঞানের পদেপদে বাঁধা বিচারপ্রণালীকে মানিয়া লইয়া তাহার বাহিরে কোন সত্য আছে এ কথা যদি অস্বীকার করিতে চাই তবে পারমার্থিক সত্যকে স্বীকার করিবারও উপায় থাকে না। জীবনের সার্থকতা তখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বড় জোর এই কথা বলা চলে যে অর্থহীন সার্থকতাহীন জীবনকে নির্ব্বিকারচিত্তে বহন করিয়া মানুষই তাহাকে সার্থকতা দান করে—মহাকালের

ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা প্রমাণ করি যে কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিবার আমাদের ক্ষমতা আছে।

মানুষের মন কিন্তু তাহাতে শান্তি পায় না। জীবনের সমস্ত অত্যাচার অবিচার হাসিমুখে বহন করিতে সে পারে, কিন্তু কেন বহন করিবে সে কথা জানিতে মানুষের মন উৎসুক। কেবলমাত্র বহিবার জন্য বহন করা, কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বাঁচাকে মানুষ তাই বাঁচিবার প্রেরণা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না—জীবনের অতীত কোন আদর্শকে স্বীকার করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি নাই। এই আদর্শের অভিলিপ্সাতেই তাহার জীবনের পরিণতি, এই আদর্শের সিদ্ধিতেই তাহার সার্থকতা।

বুদ্ধি দিয়া কিন্তু এ আদর্শকে উপলব্ধি করা যায় না। বুদ্ধি (intellect) আমাদের কাছে যে জগৎ উদ্ঘাটিত করে, ধারণার সঙ্গে ধারণার সমাবেশে তাহার যে মূর্ত্তি প্রকাশিত, সেখানে অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোন লক্ষণের পরিচয় মেলেনা। ধর্ম্মকে তাই বুদ্ধির অতীত বলা হইয়াছে—কাঙাল নয়ন যেখানে দ্বার হইতে বারম্বার ফিরিয়া আসে, সে সত্যসুন্দরকে উদ্ভাসিত করিবার ক্ষমতা মানুষের নগণ্য বুদ্ধির কেমন করিয়া থাকিবে, এই কথা বলিয়া মানুষ আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছে। তাই বলা হয় যে সৃষ্টির রহস্য অনাদি, অগম, অজ্ঞেয়। আত্মা দিয়া আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি, বুদ্ধি দিয়া তাহার ধারণা করিতে পারি না।

বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার এ দ্বন্দ্ব মানুষের সকল জ্ঞানসাধনায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে সৃষ্টির রহস্যকে মানুষ দুর্জ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অন্যদিকে বুদ্ধির আলোকে তাহাকে প্রকাশিত করিয়া যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাহাকে বুঝিতে চাহিয়াছে। ধর্ম্মের সাধনায় মানুষ যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছে বলিয়াছে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যাহাকে উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন কি? অন্যপক্ষে মানুষের বিজ্ঞানবোধ বিদ্রোহ করিয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছে যে সৃষ্টির দিগন্তের মধ্যে রহস্যের স্থান নাই—রহস্য স্বীকার করার অর্থই অজ্ঞান, আপনার অক্ষমতার স্বীকৃতি। বিশ্বাস তাই ধর্ম্মের ভিত্তি। যাহা দেখিতে পারি, যাহা শুনিতে পারি, যাহা প্রকাশ করা যায়, যাহার বিচার করিতে পারি, তাহাকে তো জানি-ই, তাহার বেলা আর বিশ্বাসের স্থান কই; যাহা অদৃশ্য, অশ্রুতিগোচর, অনির্ব্বচনীয়, অজ্ঞেয়, তাহারই বেলা বিশ্বাসের কথা উঠে—তাহাকেই আমরা ভক্তি দিয়া, শ্রদ্ধা দিয়া, অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করি। বিজ্ঞানবোধ ও ধর্ম্মবোধ তাই পরস্পরবিরোধী, কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সমন্বয়ই দর্শনের সাধনা।

দর্শনের সমন্বয়েও কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই—রক্ষিত হইতে পারেনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকদের চিন্তায় এই দুই ধারাই মিলিয়াছে, কিন্তু সেখানে কাহারো মধ্যে একটি, কাহারো মধ্যে অন্যটির প্রাধান্য। শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক যাঁহারা নন, তাঁহাদের মধ্যে এ সমন্বয়ের অভাব আরো বেশী—সেখানে কোথাও বা বিজ্ঞানবোধের একচ্ছত্র অধিকার, কোথাও বা ধর্ম্মবোধের প্রতিপত্তিতে যুক্তিতর্কের স্থান মেলে নাই। ইংরেজ দার্শনিক Hume'র চিন্তাজগতে রহস্যের স্থান নাই—সেখানে বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টির সীমান্তকে উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা। কিন্তু বুদ্ধির বিজয় অভিযান বুদ্ধিরই পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যপক্ষে Plotinus'র জগতে অনুভূতির আধিক্য—ধর্ম্মবোধের প্রবলতায় বুদ্ধির সমস্ত বাধানিষেধ, সমস্ত বিভাগ বিচারকে অতিক্রম

করিয়া দর্শন অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। Hera
Plato অথবা Kantএ কিন্তু এ একদেশদর্শিতা নাই—হেরাক্লিটাস্ তাই
বলিয়াছেন, "যাহা দেখা যায় শোনা যায়, বোঝা যায়, আমার কাছে তাহারই মূল্য
কিন্তু অন্যপক্ষে তেমনই তিনিই বলিয়াছেন, "একই নদীতে আমরা নামি এবং
আমরা আছি কিন্তু নাই-ও।" বুদ্ধিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া Kant'র
শেষ কথা—"বুদ্ধিকে সরাইয়া তাই আমি বিশ্বাসের স্থান করিয়া দিয়াছি"।

দর্শনের কোন সমন্বয়েই চিরস্থায়ী নহে। স্বাধীনতার মতন সে সমন্বয়কেও
নূতন করিয়া সাধন করিতে হয়—সদাজাগ্রত চিত্তের একাগ্রতা দিয়াই
বারম্বার নূতন করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। Kant সেই জন্যই বলিয়াছেন—
বলিয়া কিছুই নাই—কেবল আছে আমাদের প্রত্যেকের দার্শনিকতা। ইয়োরো
অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের দর্শনের কাহিনীর সঙ্গে যাঁহার পরিচয়
তিনিই একথা স্বীকার করিবেন।

বিজ্ঞানবোধ ও ধর্ম্মবোধের কোন সমন্বয়ই তাই টিঁকে নাই—কখনো
কখনো অন্যটির প্রাধান্যে সে সামঞ্জস্য লজ্জিত হইয়া নূতন সমাধানের প্রয়োজন হইয়া
ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে বিজ্ঞানের জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছিল, প্রকৃতির
রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানুষ নূতন শক্তির বলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে জয় করিয়া
দেখিয়াছিল। বিজ্ঞানবোধের এ বিজয়স্পর্দ্ধা যে দর্শনকেও অভিভূত করিবে, তাহাতে
কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন তাই প্রধানতঃ জড়বাদী, জিজ্ঞাসু এবং বুদ্ধির
বিশ্বাসী। রহস্যের অস্তিত্বকে সে স্বীকার করিতে চাহে নাই—সকল কিছুকেই
করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে—বুদ্ধির গর্ব্বে বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ধর্ম্মবোধের এ পরাজয় কিন্তু ইয়োরোপেও সকলে মানিয়া লয় নাই। বিজ্ঞান
সমস্ত কিছুই প্রমাণ করিতে পারেনা—বিজ্ঞানের অশক্তির এই পরিচয়কেও প্রমাণ
গ্রহণ করিয়া লোকে ধর্ম্মবোধকে আবার জাগাইতে চাহিয়াছে। বুদ্ধির (intelle
পরিবর্ত্তে অনুভূতি (intuition), যুক্তিবৃত্তির (understanding) বদলে
বৃত্তির (reason) আধিপত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া দর্শনকে নূতন করিয়া
করিবার চেষ্টা তাই আধুনিক ইয়োরোপেও হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বিশেষ
এই চেষ্টার অগ্রণী, রাধাকৃষ্ণন তাঁহাদের অন্যতম।

অন্যান্য আধুনিক ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণনের প্রধান
এই যে রাধাকৃষ্ণনের দর্শন ভারতীয় চিন্তাধারায় অভিষিক্ত, ইয়োরোপের দর্শনের সঙ্গে
পরিচয় নিগূঢ়—কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ধারা তাঁহার রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত। এই
ফলে ইয়োরোপের দর্শনকে তিনি ভারতের দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছেন—ভারতের
ইয়োরোপের পরিভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা ইয়োরোপের বোধগম্য করিয়া

রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের গোড়ার কথা এই যে কেবল বুদ্ধি দিয়া জীবনকে
করা যায় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকেই বুদ্ধির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা
অথচ জীবন এ অভিজ্ঞতারও বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই জীবনকে
চাহিলে আমাদিগকে বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে—যুক্তি তর্কের

(linear) প্রগতিকে ছাপাইয়া তাই দর্শনের সমগ্র দৃষ্টি। ভারতবর্ষ একথা স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই সেখানে তাহার নাম দর্শন।

An Idealist View of Lifeএ রাধাকৃষ্ণন কেবল এই কথার উপর জোর দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সেখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বিজ্ঞান নিজেই আপনার বিজ্ঞানসম্মত পথ অনুসরণ করিলে শেষে আসিয়া রহস্যের দ্বারে না পৌছিয়া পারেনা। বিজ্ঞানকে সর্ব্বব্যাপী করিতে গেলে শেষে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্মের জন্য মানুষের যে আকূতি, তাহাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের যুক্তিতে সত্যকে নিঃশেষ করা যায় না—অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে ধর্ম্মবোধের বেলা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করিবার যৌক্তিকতা কোথায়?

যুক্তির দিক দিয়া বিজ্ঞানবোধের তাই ধর্ম্মবিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিতে পারেনা। অন্যপক্ষে, মানুষের অন্তরের যে প্রেরণাকে ধর্ম্মবোধ পরিতৃপ্তি দেয়, তাহাকে মিটাইবার ক্ষমতাও বিজ্ঞানের নাই। সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই মানুষ আত্মার শান্তি খুঁজিয়াছে—কোথায় সে সাধনা সফল আর কোথায় তাহা নিরর্থক, সে বিচার না করিয়াও একথা বলা চলে, যে এই সাধনার বাস্তবতাই ধর্ম্মবোধের লক্ষ্যের সত্যতা নিরূপণ করে। বুদ্ধি দিয়া আমরা সে লক্ষ্যকে হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারি, কিন্তু জীবনের উদ্গ্রীব অভীপ্সায় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকেনা।

সমগ্রকে বুঝিবার চেষ্টায় বুদ্ধি যে যথেষ্ট নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমাভূমির মধ্যেও কেবল বুদ্ধি দিয়া আমাদের চলেনা। সাহিত্য-চিত্র-সঙ্গীত-কলার কথা ছাড়িয়া দিলেও বিজ্ঞানের রাজত্বের মধ্যেই অনুভূতির স্থান রহিয়াছে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—সে দৃষ্টিতে অংশ এবং সমূহকে পৃথক জানিয়াও তাহাদের সমন্বয় ধরা পড়ে। কেবল মাত্র বুদ্ধি দিয়া যুক্তির পরে যুক্তি সাজাইয়া যাহা জ্ঞাত, যাহা প্রকাশিত, তাহার সংগঠন বোঝা যাইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাতের আবিষ্কার, অপ্রকাশিতের উদ্ভাসনে যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে একবার অন্যান্যক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইলে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

রাধাকৃষ্ণন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে এই ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার সাহায্যে জীবনের চরম সত্যকে প্রতিভাত করিতে চাহিয়াছেন। সে সত্যকে বর্ণনা করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না—এমন কি প্রকাশ করা যায় না। অনুভূতি দিয়া তাহাকে উপলব্ধি করা যায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাহা জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যেমন করিয়া বিদ্যুচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার সহসা শিহরিয়া ওঠে। জীবনে যুক্তির স্থান অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু যুক্তি কেবলমাত্র প্রমাণ যোগায়, যাহা প্রামাণ্য তাহা কেবল অনুভূতিতেই মিলে।

বুদ্ধির অপ্রাচুর্য্য (insufficiency) এবং অনুভূতির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে রাধাকৃষ্ণনের কৃতিত্ব, কোন নূতন বা চমকপ্রদ কথার জন্য নহে। তাঁহারই ভাষায় যাহা কিছু সত্য তাহাই চিরপুরাতন। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে চিরপুরাতন সত্যকে তিনি নূতনভাবে সাজাইয়া লোকের সামনে দাঁড় করাইয়াছেন, চিরকালের সত্যকে তিনি আধুনিক যুগের ভাষা দিয়াছেন। তাঁহার ভাষার সৌষ্ঠব এবং বোধগম্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ, বহু বিষয়ে বহু ব্যাপক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এই প্রকাশক্ষমতার মিলনে ধর্ম্মবোধের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তি এই বিজ্ঞানের যুগে এই কালের ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

Religion in the East and Westএও রাধাকৃষ্ণন সেই আবার বলিয়াছিলেন। মানুষের আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে জানে—এই জ্ঞান দিয়া নহে, ধারণা দিয়া নহে। বুদ্ধি দিয়া আমরা যাহা জানি, তাহা পরোক্ষ, তাহায় নানা দ্বন্দ্ব রহিয়াছে এবং চিরদিনই থাকিবে। ধারণা এবং ধারণার বিষয় এবং জ্ঞানের নায়কের সঙ্গে জ্ঞানের বস্তুর বৈষম্য বুদ্ধি কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে অথচ এই দ্বৈতবোধকে মিটাইতে না পারিলেও আত্মার শান্তি নাই। আত্মার উপলব্ধি আমাদের অভিজ্ঞতার ভাষায় তাহাকে তাই ব্যক্ত করা যায় না, তাহা অভিজ্ঞতার মধ্যে গণ্য করাই কঠিন, কারণ সমস্ত দ্বন্দ্ব, সমস্ত বৈষম্যকে অতিক্রম করিয়া এই উপলব্ধি। পারমার্থিক সত্যের দিক দিয়া জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈ তাই কেবলমাত্র মায়া—এই মায়াকে লঙ্ঘন করিবার সাধনাই মানুষের মুক্তির সাধনা মায়ার ব্যাবহারিক সত্তাকে তাই বলিয়া অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্যকে পারমার্থিক বলিয়া গ্রহণ করি বলিয়াই আমাদের জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনা। তাহার রহিয়াছে আমাদের বুদ্ধির অক্ষম স্পর্দ্ধা, কারণ অনুভূতিতে আত্মা যাহা উপলব্ধি করে পারমার্থিক বলিয়াই তাহা অনির্ব্বচনীয়। বুদ্ধি তাহাকে জানেনা অথচ প্রকাশ করিতে চাহে, আয়ত্ত করিতে পারে না, অথচ যুক্তি দিয়া বিচার করিতে চাহে। ফলে বাস্তব পরিভাষায় বুদ্ধি যাহা প্রকাশ করে, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি নহে, অনুভূতির বিকৃতি, আত্ম উপলব্ধি নহে, কেবলমাত্র উপলব্ধির প্রাণহীন কঙ্কাল। কঙ্কাল যে প্রাণহীন, সে ভুলিয়া যাই বলিয়া আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সত্যের সঙ্গে বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাবহারিক সত্যের বিবাদ প্রতিমুহূর্ত্তেই চলিয়াছে। সমাজরীতির ভিত্তিও এই ব্যাবহারিক সত্য, তাই সমাজের কাছে তাহার লঙ্ঘনই পাপ, কিন্তু সমাজের ভয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অস্বীকার করিয়া আমরা আত্মার অবমাননা করি। রাধাকৃষ্ণনের মতে তাই বিপ্লবই সৃষ্টির ভিত্তি—প্রাচীন জীর্ণ রীতিকে লঙ্ঘন করিয়া আত্মার নিত্য প্রকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব। বুদ্ধি কিন্তু আত্মার সে সত্যকে চেনেনা—বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া অনুভূতি দিয়াই আমরা পারমার্থিক সত্যকে পাই।

এখানে দুইটি প্রশ্নের উত্থাপন করা যাইতে পারে। পারমার্থিক সত্যকে জানিবার পক্ষে বুদ্ধি যথেষ্ট নয় একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অনুভূতিই যে পারমার্থিক সত্যকে উদ্ভাসিত করে তাহা মনে করিবার কারণ কি? অবশ্য বলা যাইতে পারে যে ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল, কাজেই তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহা বলিলেও প্রশ্ন ওঠে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কি সকল সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য? এ সংসার আমাদের সকলের ভুল হয়, অথচ সে সব ভুল অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। মরুভূমির মরীচিকা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাহা অস্বীকার করিবার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনি সে অভিজ্ঞতা যে ভ্রান্ত তাহা স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই। কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলিলেও আমাদের সন্দেহ মিটিতে পারে না—সে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে বলিয়াই মানুষ মানুষ। অন্ততঃপক্ষে মরীচিকা ভ্রান্তি প্রভৃতির আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার দোহাই দিলে মানুষের মন তাহাকে মানিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিবেই।

Santayanaর বক্তব্যও তাই। তিনি বলিতে চান যে অতিআধুনিক জগতে যে অনুভূতির প্রতি বিশ্বাস আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ অভিজ্ঞতার

প্রত্যক্ষতা নহে। তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ মহাবিপ্লবে। পূর্ব্বে বিজ্ঞান রহস্যকে স্থান দেয় নাই—সৃষ্টিকে গণিতের মত বোধগম্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেই চেষ্টার সাফল্যেই আজ প্রতিভাত হইতেছে যে গণিতও পরম রহস্যময় হইয়া উঠিতে পারে। বিজ্ঞানে হেঁয়ালী ঢুকিয়াছে বলিয়াই আজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির আদর বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে হেঁয়ালীর কারণ তো আমাদের অজ্ঞতাও হইতে পারে। আমরা বা আমাদের যুগ এ সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই যে সৃষ্টির সত্য অজ্ঞেয়, তাহা মনে করিবার কারণ কি? অধিক সময়ে সে জ্ঞান তো আসিতেও পারে—এবং না আসিলেও বুদ্ধির যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কারণ কি? জ্ঞানের অভাবের অর্থ যে আমরা জানিনা। অভাবের জ্ঞানের অর্থ যে আমরা জানি যে অভাব রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণন অবশ্য এ কথার উত্তর দিতে পারেন যে বুদ্ধির গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে—বুদ্ধির স্বভাবই স্ববিদ্রোহী, কাজেই আমাদের বা আর কাহারো বুদ্ধিগত জ্ঞানের পরিমাণের প্রশ্ন ওঠে না। সে কথা মানিয়া লইলেও বুদ্ধির অসাফল্যে অনুভূতির সাফল্য যে কি ভাবে প্রমাণিত হয়, সে প্রশ্ন সমস্যাই থাকিয়া যায়। তবু আধুনিক জগতের আধুনিক পরিভাষায় রাধাকৃষ্ণন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবোধের দ্বন্দ্বের এ সমস্যা তুলিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। Joadর বইখানি রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের সম্বন্ধে—কিন্তু তাহাতে আলোচনা বা বিচারের একান্ত অভাব বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে Joadর ভাষা সরল ও সতেজ, এবং অপরের মতামত নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। কাজেই বইখানি লঘুপাঠ্য হইলেও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু Joad'র কাছে সংবাদপত্রের বিবরণের অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের আলোচনা পাইলেই আমরা বেশী সুখী হইতাম। ইহাতেও রাধাকৃষ্ণনের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ Joad রাধাকৃষ্ণনের প্রতি শ্রদ্ধায় এত অভিভূত, যে সমালোচনা করিবার কথাই বোধ হয় তাঁহার মনে একবারও উঠে নাই।

হুমায়ুন কবির

Better Think Twice About It:—by Luigi Pirandello. Translated by Arthur and Henrie Mayne. (John Lane, the Bodley Head Ltd.)

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ছোটগল্পের বই। তেরটি গল্প, সংগৃহীত হয়েছে লেখকের তেরখণ্ড গল্পগুচ্ছের কেতাব থেকে, অর্থাৎ চালের বস্তায় খোঁচা মেরে ছুঁচ্‌লো 'সোনায়' ধরা একটুখানি নমুনা মাত্র।

অনুবাদক ভূমিকায় বলেছেন যে পিরাণ্ডেলোর গল্পিকার ইংরাজি তর্জ্জমা এই প্রথম বাহির হল,—যদিচ Great Short Novels of the Worldএ এই লেখকের একটি গল্প (যা' এ সংগ্রহে নেই) ইতিপূর্ব্বে বাহির হয়েছে দেখেছি। অধ্যাপক.

পিরাণ্ডেলো সুপণ্ডিত এবং সাহিত্যিক।* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রচিত পুস্তকের যথা :—কবিতা ৭, উপন্যাস ৭, গল্পগুচ্ছ ১৩, নাটক ২৮। এ ছাড়া তিনি সমালো

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যদি যথার্থ কবি হন, কিম্বা বিকল্পে, স্বভাবকবি জড়বিজ্ঞানে বা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী হন, তবে তাঁর সাহিত্যরচনায় তত্ত্বকথাটা হয়ে হয় রস-সিন্দুর। গল্প ক'টি পড়ে, বিশেষতঃ তিন চারিটির রচন-নৈপুণ্যে, পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিচিত্রতা এবং প্রসারও খুব, লেখকের গলায় মুদারা তারার তিন সপ্তক স্বরের বহর এবং কারচুপি আছে।

দ্বিতীয় গল্পটির নামে বইখানির নামকরণ হয়েছে। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' উপাখ্যানে করুণ, হাস্য ও বীভৎস রসের যে সমাবেশ হয়েছে, তার ভিতর বিধিনিষেধের বন্ধনদশায় আদিম মানবের যে ছবিটি ফুটেছে তাতে বিতৃষ্ণার সঙ্গে অনুকম্পা হতভাগ্য বৃদ্ধের সম্বন্ধে স্বতঃই মনে জাগে। "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ বিধিঃ কো নিষেধঃ ?"—শঙ্করের এই বাক্যটির যদি এইরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যা করা যায় স্ত্রীগুণ অর্থাৎ নারীবশীকরণ, তদ্ভাববিরহিত পথে, কিনা বার্দ্ধক্যে, বিধিই বা কি নিষেধই বা কি—তা হ'লে বৃদ্ধ অধ্যাপক টোটির প্রবীণতার ও কার্য্যকলাপের সহজ নিরিখ পাওয়া যায়। লোকটা নিষ্কাম স্বার্থপরতার সোনার পাথর বাটি। Jar গল্পটি নিছক্ হাস্যরসের ভাঁড়। The Other Sonএ বৃদ্ধ ভিখারিণীর জীবনের সংগৃহীত ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে কত দুঃখ; কত আশা, কত পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা' প্রতিভাশালী ও দরদী লেখকের রচনা না হ'লে এ পরিসরের মধ্যে এমন জাজ্জ্বল্যমান্ হ'তে পার্ত না। ছোট্ট একটি গল্পের লেখক একটুর মধ্যে অনেকখানি আমাদের দৃষ্টিগোচর করাতে পারেন। Wet Nurse লেখক যাদুকরের মত ধামা চাপা দিয়ে একটি বিষবৃক্ষের বীজবপন থেকে পর্য্যন্ত পাঠকের চোখের সাম্‌নে দেখিয়েছেন। এটা লেখামাত্র নয়, একেবারে যা যুগপৎ চোখের ও কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। দাম্পত্যজীবনের থিটিমিটির আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত বাপমায়ের একমাত্র আদুরে মেয়ে পিত্রালয়ের কেমন করে স্বামীর ঘরে নিয়ে গেল এবং তার প্রথম সন্তানের জন্য নিযুক্ত যুবতী Nurseএর কপাল পুড়্‌ল এই পরিবারের সম্পর্কে এসে, তার নিখুঁৎ চলচ্চি গল্পটি। Chants the Epistleএ একটি নিঃসঙ্গ সত্য-সন্ধ যুবক হাসি গঞ্জনার মধ্যে কেমন করে একটা ঘাসের ফুলের স্নেহে প্রাণটাকে তাজা রেখে মিথ্যাপবাদের ফেরে পড়ে' 'ডুয়েল'এ নাম্‌ল এবং পিস্তলের গুলি বুকে নিয়ে জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ কর্‌ল, তারি একটা মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ। আর গল্প আছে যা ব্যঙ্গকৌতুকে বিশ্লেষণদীপ্তিতে সমুজ্জল।

গল্পগুলির ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও ছেদ নাই, এমন সহজ সুন্দর ক্রম তা'তে। এমনি করেই ত জীবনের ছোট বড় কত ঘটনাই ঘট্‌চে, তাদের মধ্যে নিগূঢ় যোগ আছে বটে কিন্তু কোথাও তালিজোড়া নাই। 'প্লট্' আপন ঋজুকুটিল গতিতে চলেছে, কোথাও খাপছাড়া ঠেকে না। যেটা অপ্রত্যাশিত ঘট্‌ল তখন মন বিনা আপত্তিতেই সায় দিলে। যেন একজনকে বরাবর

* গল্পলেখক হিসাবে পিরাণ্ডেলো মোপাসাঁ চেকভের সমকক্ষ এরূপ একটা খ্যাতি য়ুরোপে

এসেছি, তারপর সে এমন একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে বস্‌ল যার তীব্রদীপ্তিতে লোকটার চালবাজি আগাগোড়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল এবং রাগটা যেন তার উপর না হয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতার উপরই হ'ল। লেখক ঠিক সমে এসে থাম্‌তে পারেন ও পাঠকের সুপ্রসন্ন শিরঃসঞ্চালন অর্জ্জন করেন।

একটা ট্রাজেডির সুর লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে ফুটেছে মনে হয়। এটা দুঃখবাদীর কালো চশ্‌মার ভিতর দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখা নয়। রংটা লেখকের মনে নয়, এই ধরিত্রীর গায়ের রং। বসুন্ধরা ত গৌরী নন, তিনি শ্যামাঙ্গিনী। যে দিক্ দিয়েই দেখি, পেয়ে অতৃপ্তির খেদ, না পাওয়ার বেদনা, পেয়ে হারানোর শোক ইত্যাদিতে সংসারটা দুঃখময়। নিপুণ শিল্পী যখন হুবহু ছবি তোল্‌বার জন্য তুলি ধরেন, তখন তাঁর মনে যত স্ফূর্ত্তিই থাকুক্, সেটাতে যদি তুলি না ডোবান তা' হ'লে, ছবিগুলি বোধহয় অধিকাংশ স্থলেই একটু কজ্জলাভ হবে। যে পৃথিবীর তিনভাগ লবণাম্বুরাশি তার অধিবাসী জীবদের হাসির চেয়ে অশ্রুর সম্বলটা বুঝি সেই অনুপাতে বেশী।

প্রবীণ লোকের ভাব, চিন্তা, কল্পনা ও ভাষার মধ্যে বহু অভিজ্ঞতার একটা সূক্ষ্ম নির্য্যাস না থেকে পারে না। পুরানো বেহালার সুরের মত তা'তে বহুশ্রুতি-সম্বলিত একটা মিশ্র অনুরণন মিশে থাকে। অনেকদিনের অনেক কম্পনের লিপি বেহালার রন্ধ্রে যে জমাট হয়ে আছে। তা'তে সুরের মাধুর্য্য বাড়ে বই কমে না। এই ভাব-বৈদগ্ধ্য লেখকের রচনায় পরিস্ফুট।

তবু এত কথা বলচি কেবলমাত্র তর্জ্জমা পড়ে, এবং এমন সব ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক মণ্ডলের সম্বন্ধে, যাদের সঙ্গে আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের মত কূপ-মণ্ডূকের পরিচয় নিতান্ত পরোক্ষ। তবু যে ভাল লেগেছে তা'তে বোধহয় এই প্রমাণ হয় যে, আমাদের সকলের মধ্যেই বিশ্বমানব বিদ্যমান্, এবং প্রকৃত শিল্পীর রচনায় এমন কিছু আছে যার প্রকাশ হাসিকান্নার মতই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভাবিক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

Sanctuary ; Sartoris ; Light in August ; These Thirteen—by William Faulkner (Chatto and Windus).

আমি সাহিত্যে জঙ্গমতার পক্ষপাতী। মানবসত্য যদিও মূলত সনাতন, তবু তার অভিব্যক্তি যুগে যুগান্তরে নির্ব্বিকার থাকলে, যেটা একদিন প্রেরণারূপে দেখা দেয়, অবশেষে সেটা পরিণত হয় অন্ধ অভ্যাসে। সকল সাহিত্যস্রষ্টাই এই কথাটাকে পাকে-প্রকারে মেনে নিয়েছেন। সেইজন্যেই গ্রীক ট্রাজেডির ঐক্যত্রয় শেক্‌স্‌পীয়রের সমর্থন পায়নি, এবং রাসিন্ এলিজাবেথীয় নাটকের অসংহত উচ্ছ্বাসকে ভয়ের চক্ষে দেখেছিলেন। সেইজন্যেই ডিফো, ষ্টার্ণ ও ফিল্‌ডিঙ্-এর কথাসাহিত্য স্কট্, ডিকেন্‌স্, থ্যাকারেকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি, এবং আধুনিকেরা ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকদের পদাঙ্ক ছেড়েছেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন শুধু পরিবর্ত্তন বলেই শ্রদ্ধেয় নয়, তার পিছনে নিত্যের তাগিদ থাকলে, তবেই তা গ্রাহ্য। সুতরাং এমন বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে সাহিত্যে রূপ যে-কাজ করে, সমাজে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় টাকায়। অর্থাৎ মূল্য

জিনিসটা চিরন্তন কিন্তু মুদ্রা ক্ষণস্থায়ী। মুদ্রা মূল্যের প্রতিনিধি, কাজেই কালক্রমে জালিয়াতের কৃপায় যদি তার প্রতিনিধিত্বে ঘুণ ধরে তবেই তার পরিবর্ত্তন অনিবার্য পড়ে, নচেৎ তার আকারে-প্রকারে ইতরবিশেষ ঘটে না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের সমসাময়িক লেখকেরা একথাটা প্রায়ই ভুলে হয়তো যে-ধনতান্ত্রিক যুগে মুদ্রা মূল্যের সমকক্ষ হয়ে ওঠে, তাতে রূপ ও রসের স্বরূপ বিচার অসম্ভব; হয়তো বিকারনিষ্ঠ বের্গ্‌সঁ-র তত্ত্ববিস্তায় প্রাচীনপন্থী দার্শনিকেরা যা বের করেছেন তার অধিকাংশই কাল্পনিক; হয়তো—। কিন্তু কারণ সন্ধান এ অসার্থক, কারণ যাই হোক, এটা নিশ্চয় যে পাউণ্ড্‌, এলিয়ট্, জয়েস্ ইত্যাদির প্রকৃত শিল্পীরাও মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তনকে শুধু পরিবর্ত্তন হিসাবেই প্রশ্রয় দিয়ে গারট্রুড্ ষ্টাইন্, ম্যাক্‌লাইশ, কামিংস্ প্রভৃতি বাগ্‌জীবনেরা মাত্র উদ্‌ভটতার কল্যাণেই প্রতিভার অংশিদার হয়ে ওঠেন; এবং হাক্‌স্‌লির মতো নকলনবিশ কেবল ভেকধারী ক্ষিপ্রতায় অর্জ্জন করেন ভাবস্বকীয়তার খ্যাতি। ষ্টেচির ভাষায় অষ্টাদশ শতকের ওজোগুণ দেখি ব'লে তাঁর অপূর্ব্ব মৌলিকতা আজ অস্বীকৃত, ফর্ষ্টার-এর নিখুঁত উপন্যাসগুলি অধুনাতনী অস্তব্যস্ততার ধার ধারেনা বলে তাঁকে আজ আমরা ভুলে বসেছি,, ইয়েটস্-এর কবিতায় শাশ্বত সত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর বিস্ময়াবহ নবীন সজীবতা আমাদের দৃষ্টির অগোচর।

শেষোক্ত তিন মহারথী সম্বন্ধে যা বললুম তার থেকে এমন মনে করলে অন্যায় হবে যে এঁরা চিরাচরিত পথেই দিগ্বিজয় আবদ্ধ রেখেছেন। বরং উল্‌টোটাই বেশি সত্য। মানবমনের এমন দিক খুব কমই আছে যার ভৌগলিক পরিচয় এঁদের লেখা থেকে করা যাবে না। এ কথা ভাবলেও ভুল হবে যে পদ্ধতির চেয়ে প্রসঙ্গের প্রতিই এঁদের বেশি নজর, অথবা কলাসৃষ্টিতে এঁরা যতখানি পারদর্শী, কলাকৌশলে ততখানি সিদ্ধহস্ত নন। গোয়টের সময় থেকেই প্রত্যেক সাত্ত্বিক সাহিত্যিক শিল্প ও স্বভাবের প্রকৃতিগত প্রভেদ অনুভব করে আসছেন; এবং উক্ত তিন লেখকের ক্ষেত্রে এই মূলগত পার্থক্য যে কেবল নীরবে স্বীকৃত হয়েছে, তা নয়, কলা এবং কৌশলের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিয়ে এঁরা বিস্তারও করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু তাহলেও, শিল্পপ্রকরণ প্রসঙ্গে এঁদের তিনজনের মতামত অনেক সম্প্রতিবিদের সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা। প্রথম থেকেই এঁদের রচনায় একটা স্থৈর্য্য দেখা গেছে, যা আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ; এবং পরীক্ষায় যদিও এঁরা সদা প্রস্তুত, তবু এঁরা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলে যাননি যে পরীক্ষা শুধু তখনই সার্থক, যখন তার সাহায্যে একটা স্থায়ী ও অবিকল শিল্পসামগ্রীর সন্ধান মিলে। বহুল পরিবর্ত্তনের মধ্যে এঁরা এই আর্য্যসত্যের প্রতি আস্থা রেখেছেন যে রূপ ও রসের অবিভাজ্য সামঞ্জস্যই সাহিত্য নামে অভিহিত করা চলে। তাই এঁদের পদ্ধতি সব সময়ে হয়তো কালোপযোগী হয় না; কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক সদাসর্ব্বদা অটুট থাকে।

ফক্‌নার-এর মতো অত্যাধুনিক লেখকের আলোচনায় উক্ত ধ্রুবপদী সাহিত্যিকদের উল্লেখ নিশ্চয়ই অবান্তর। কিন্তু লেখার ঝোঁকে ওই তিনজনের নাম কলমের ডগায় দৈবাৎ এসে গেলে ব'লেই আমি ওঁদের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠিনি, অনেক ভেবে চিন্তে তবে ওঁদের এই প্রবন্ধে স্থান দিয়েছি। কারণ ওঁরা যদিও প্রায় সকল রকমেই পরস্পর ও ফক্‌নার-এর থেকে পৃথক, তবু একটা অতিপ্রয়োজনীয় দিকে ওঁদের সঙ্গে অত্যাধুনিক লেখকের সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য রূপজ্ঞানে। প্রথম প্রকাশিত রচনা থেকেই

তিনজন রূপসম্বন্ধে যে নির্ব্বিকল্প মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন, তার জোড়া ইদানিকার লেখকদের মধ্যে মাত্র ফক্‌নার-এর উপন্যাসেই আমি পেয়েছি। তার মানে এ নয় যে সাধনায় বা সিদ্ধিতে ফক্‌নার ওঁদের সমকক্ষ, তার মানে শুধু এই যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচখানা উপন্যাস ও একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করার ফলেও ফক্‌নার অন্যান্য অধুনাতনী লেখকের মতো কোনো মুদ্রাদোষের আভাস দেননি। পরীক্ষায় তাঁর উৎসাহ যদিও অপরিমেয়, তবু ঔপন্যাসিকের প্রথম কাজ যে রোমাঞ্চসঞ্চার নয় গল্প বলা, সেকথা তিনি একবারও ভোলেননি। ফলে তাঁর অনেক লেখাকেই অনেক সময়ে কষ্টপাঠ্য লেগেছে, কিন্তু কোনোটিকেই কখনো অনাবশ্যক মনে হয় নি; মাঝে মাঝে বোধ হয়েছে তাঁর কথকতার ভঙ্গী অপ্রত্যাশিত রকমের জটিল, কিন্তু বই বন্ধ করে বোঝা গেছে যে ঠিক সেই গল্পটি অভ্যস্ত উপায়ে বলা আদৌ সম্ভব ছিলো না; বহু স্থানে বহু পূর্ব্ব সূরীর প্রভাব তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অবশেষে মানতেই হয়েছে যে আধুনিক-রুচিসম্মত আদর্শের অনুকরণে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করেননি, করেছেন উজ্জ্বলতর। যত সাম্প্রতিক শিল্পপ্রকরণ নিয়েই তিনি পরীক্ষা করুন না কেন, ফক্‌নার কখনো বিস্মৃত হননি যে ঔপন্যাসিকের প্রথম কর্ত্তব্য তাঁর চরিত্রাবলীর প্রতি,—তারা জীবন্ত, এবং জীবনে উৎকট-তার স্থান থাকলেও উদ্‌ভটতা একেবারেই অচল।

হয়তো প্রশংসা একটু বেশি রকমের হয়ে গেলো। কিন্তু তাই ব'লেই এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে আমি ফক্‌নার-এর দোষ সম্বন্ধে অচেতন। তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে প্রত্যক্ষতার অভাব। আধুনিক নভেলের যেটা মুখ্য দৌর্ব্বল্য,—অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিকতা, তার আকর্ষণ ফক্‌নার যদিও গোড়া থেকেই এড়িয়ে চলেছেন, তবু জোরালো কথাকে ঘোরালো করে বলার শিশুসুলভ অভ্যাস তিনি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অবশ্য এই পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থনে ধ্রুপদী নজির সংগ্রহ করা শক্ত নয়। গ্রীক নাট্যকারেরাও সাধারণত তাঁদের ট্রাজেডির দুর্ঘটনা-গুলোকে দর্শকের চোখের সামনে আসতে দিতেন না, তার ফলাফল জ্ঞাপন করতেন সাক্ষীর জবানীতে। ইব্‌সনের নাটকও যে দুর্ব্বিপাকের পটভূমিতে রূপ পরিগ্রহণ করে, তা ততটা দৃষ্টিগোচর নয়, যতটা অনুমেয়। কিন্তু নাটকে এই উপায় সিদ্ধ হয়েছে ব'লেই, একে উপন্যাসে স্থান দেওয়া মার্জ্জনীয় নয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে সাহিত্যের—নাটকাদি প্রাচীন অঙ্গগুলোর সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করার জন্যেই উপন্যাসের সৃষ্টি। সুতরাং এখানেও যদি সক্রিয়তার খাতিরে সঙ্গতিকে খর্ব্ব করতে হয়, তবে উপন্যাসের আবশ্যকতা নেই। অবশ্য এই আপত্তির জবাবে ফক্‌নার বলতে পারেন যে এমনি পঙ্ককুণ্ডে তাঁর গল্পগুলির জন্ম যে সে-বিষয়ে স্পষ্টভাষণ অত্যাধুনিক সমাজেও অচল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, "স্যাংটুয়ারি" উপন্যাসটির নাম করা যেতে পারে। তার পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে, ভব্যতা তো দূরের কথা, সভ্যতার সম্পর্কও এত শিথিল যে তাদের কার্য্যাবলীর সোজা বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব। এবং এই চরিত্রগুলির সম্বন্ধে যে-কথা খাটে, ফক্‌নার-এর অন্যান্য কুশীলবদের প্রসঙ্গেও তা প্রযোজ্য।

ফক্‌নার-এর দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে এই বিকার-নিষ্ঠা। যত দূর মনে পড়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা প্রায় শূন্য। তাঁর গ্রন্থাবলী তন্নতন্ন করে খুঁজলে এমন দু-একজন মানুষ হয়তো পাওয়া যায়, যারা নিঃস্বার্থ আদর্শের সঙ্গে একেবারে

অপরিচিত নয় ; কিন্তু তারাও সাধারণ স্তরের নিচে, তাদের মধ্যেও
হয় পাগল, নয় অসুস্থ, সকলেই অক্ষম ও উৎকেন্দ্রিক। অবশ্য এ অভিযোগ
উত্তর আছে, এবং ফক্‌নার অনায়াসেই বলতে পারেন যে ঔপন্যাসিকমাত্রেই
সাধারণকে ছেড়ে বিশেষকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি যদি পাহাড়ে না-চড়ে
ঘুরে বেড়ান, তবে তাঁর জীবনবেদের প্রতি কটাক্ষ করা অনুচিত।
দৃষ্টিতে উর্দ্ধগমন আর অধোগমনের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই ; দুটোই
থেকে সমান দূরে। কাজেই উপরে উঠেও যদি বস্তুজগতের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন
হয়, তবে নিচে নেমেও তার আকর্ষণ অটুট থাকবে। তা ছাড়া আধুনিক
অপ্রাকৃতকে আমল দেয়না ; বিশেষজ্ঞদের মতে মনের ধর্ম্মই হচ্ছে বিকৃতি।
যখন ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃতিস্থ বলা হয়, তখন সে-প্রশংসা তার অন্তঃপ্রকৃতির প্রাপ্য
তার বহিঃপ্রকৃতিই অনিন্দ্য। অর্থাৎ তখন এইটেই বক্তব্য যে
বিশৃঙ্খলায় সে সর্ব্বসাধারণের সমকক্ষ হলেও, তার পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলা
সুপ্রতিষ্ঠ যে আভ্যন্তরিক অশান্তি সেই শাসনে অবদমিত হয়ে যাচ্ছে।

ফক্‌নার-এর নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ যে-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে থাকেন,
সমাজবন্ধন প্রায় অবিদ্যমান। মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাপথে স্থৈর্য্যের চলাচল
নবভূভাগে সিতাসিতের সংঘর্ষ বোধহয় ওই অঞ্চলেই প্রথম বাধে ; দক্ষিণীদের চাল
জন্যেই দাসপ্রথার প্রচলন হয় ; ভ্রাতৃবিরোধ এমেরিকার ওই দিকটাকেই কুরুক্ষেত্র
পর্য্যায়ভুক্ত করে ; এবং ওইটাই লিঙ্কিঙের জন্মভূমি। মার্কিনী প্রগতির
উত্তরাভিমুখী ; সে-দেশের নাগরিক সভ্যতা উত্তরেরই দান ; এমেরিকার আদর্শ
মহামানবগণ প্রায় সকলেই উত্তরে উৎপন্ন। দক্ষিণ কৃষিপ্রধান, অলস,
এদিককার হালচাল জমিদারি ধরণের ; এরা শক্তি চায় কিন্তু শক্তি অর্জ্জন
জানে না, শাসনে বিশ্বাস করে কিন্তু রাষ্ট্রে আস্থা রাখেনা, স্নেহের অর্থ
কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠার ধার ধারে না। কাজেই এখনকার মানুষ সঞ্চয়ের চেয়ে
বেশি সিদ্ধহস্ত, সদাচারের চেয়ে অনাচারেই অধিক পটু, জীবনের চেয়ে
দিকেই তাদের টান নিবিড়তর। এ-অবস্থায় উত্তরের কাছে তাদের
পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এবং এই রকম পরাজয়ের মানেই হচ্ছে গ্রাম উচ্ছেদ
গড়া, শস্য তুলে ফেলে ফ্যাক্‌টারি বসানো, পরিজনের বদলে পরজীবীদের
কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রতিযোগিতায় বাহির চিরদিন অন্তরকে হটিয়ে এসেছে ;
প্রাগ্রসর উত্তর আমন্থর দক্ষিণকে স্থিতি দিতে পারে না, কেবল করে
যাত্রার উন্মূলন। ফলে বিকৃতি সেখানে প্রকৃতির নামে চলে, অত্যাচার
লোকাচারের অন্তর্গত ; সমাজ সেখানে সংঘের কাছে হার মানে ; এবং সেই
যে সংবেদনশীল লেখকের জন্ম হয়, তার চক্ষে অনিষ্টই হয়ে ওঠে মানবজীবনের
সত্য, একমাত্র সত্তা।

অবশ্য অনিষ্ট কেবল দক্ষিণেরই নিজস্ব সম্পত্তি নয়, উত্তরেও তার যথেষ্ট
এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মনুষ্যজীবনের অনেকখানিকেই ওই শব্দের মধ্যে
করা যায়। অতএব এই দিকে ফক্‌নার-এর অতিচেতনাকে দোষ না-বলে,
হয়তো শ্রেয়, এই অনিষ্টজ্ঞানই বোধহয় ফকনার্-এর স্থান-কালানুগত সাহিত্য
একটা সার্ব্বভৌমিকতা দান করেছে, তাঁর অতিবিশেষ চরিত্রগুলিকে

আদর্শের নৈর্ব্যক্তিক লোকে। কিন্তু তাহলেও অনিষ্টের সঙ্গে অনিষ্টের সংঘর্ষে যে-ট্রাজেডি উদ্ভূত হয়, তার ব্যাপ্তি ও হৃদয়স্পর্শিতা আমার বিবেচনায় অল্প। তা দেখে দর্শকের চিত্ত তেমনতর শুদ্ধ হয় না, যেমন হয় ইষ্টের সঙ্গে ইষ্টের সংঘাতে। কারণ ট্রাজেডির মূলমন্ত্র ততটা দুঃখ নয়, যতটা করুণা, এবং করুণা ইষ্ট সম্বন্ধে যত সহজে জাগে, অনিষ্টের সম্পর্কে তত অনায়াসে আসেনা। সুতরাং অনিষ্টের অনুধাবন করে সাহিত্যস্রষ্টা হয়তো স্বভাবতই নিরাসক্ত থাকতে পারে, কিন্তু অনুকম্পা, যার ব্যতিরেকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি একেবারেই অসাধ্য, তার সংস্পর্শও তাকে স্বতই এড়িয়ে যায়। এইজন্যেই বোধহয় অনেক কোমলহৃদয় পাঠক ফক্‌নার-এর লেখায় একটা অমানুষিকতার পরিচয় পেয়েছেন, একটা দাক্ষিণ্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন, বলেছেন যে 'দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি', অথবা 'স্যাংচুয়ারি'-র উপমেয় কোনো রসসাহিত্য নয়, তাদের সঙ্গে কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রেরই তুলনা চলে।

কিন্তু ওই বই দুখানি যে নিরাসক্তি-সাধনের পদ্ধতি মাত্র, ফক্‌নার-এর চিত্তবৃত্তির আসল পরিচয় নয়, তার আভাস পাওয়া গিয়েছিলো 'সার্টোরিস্' উপাখ্যানে। এই আধ্‌পাগলা পরিবারের ইতিহাস লিখে তিনি দেখিয়েছিলেন যে কারণকর্দ্দমে তাঁর যেমন অবাধগতি, স্বপ্নের নির্ব্বাত লোকেও তেমনি ; প্রয়োজনের তাগিদে তিনি যেমন সাংবাদিক হতে পারেন, তেমনি আবশ্যকমতো গীতিকবিতাও তাঁর আয়ত্তে। বলাই বাহুল্য যে এখানেও, ফক্‌নার-এর সাধু চরিত্রগুলির যা বিশিষ্ট লক্ষণ, অর্থাৎ ব্যর্থতা, তা ভূরি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তবু এটাও স্পষ্ট যে লেখক এখন আর কেবল অনিষ্টকেই জগতের একমাত্র উপাদান ব'লে বিবেচনা করেন না, তিনি জানেন যে বিশ্বব্যাপারে ইষ্টের মাত্রাও বেশ গণ্য। তাই সার্টোরিস্-এর পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ভালোমন্দ দুয়েরই সন্ধান পাই, অবশেষে মন্দেরই জয় হয় বটে, কিন্তু ভালোর মামলাও যে আপীলে জিত হতে পারে, এমন ইঙ্গিত, মনে হয় যেন, লেখকের অনভিপ্রেত নয়।

এই বইখানি পড়ার পরে আমার মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলোনা যে ফক্‌নার সিদ্ধির দিক দিয়ে খুব বড় ঔপন্যাসিক না-হলেও, অন্তত সম্ভাবনার বিচারে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তাঁর প্রত্যেক বইয়েই দেখেছিলুম যে দু-এক কথায় একটা জীবন্ত চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর সমকক্ষ আধুনিক সাহিত্যে কমই আছে। অবশ্য কথোপকথন রচনায় তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারিনি, কিন্তু এ-বিদ্যাতেও তিনি এণ্ডার্সন, ডস্ পাসজ্ ইত্যাদি অধুনাতনী মহারথীদের যে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছেন, তাও অল্পেই বুঝেছিলুম। তাঁর দোষগুলোর কথা পূর্ব্বেই বলেছি ; এবং এগুলো আমাকে শুরু থেকেই পীড়া দিয়ে এসেছে। কিন্তু তাহলেও 'সার্টোরিস্'-এ তাঁর মনের যে-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পেয়েছিলুম, তাঁর চোখে যে-জাগতিক নিরীক্ষার চমক দেখেছিলুম, তার পরে তাঁর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমার আর কোনো দ্বিধা ছিলো না ; বুঝেছিলুম যে আজ না-হোক, কাল না-হোক, পাঁচ, সাত, দশ বৎসর বাদেও, তিনি একখানা স্মরণীয় উপন্যাস লিখবেনই লিখবেন। আমার এই প্রত্যাশা অচিরেই পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হয়েছে অপ্রত্যাশিত রকমের বাহুল্যসহকারে। জানতুম এতখানি সাধনা কখনোই বিনাপুরস্কারে যাবে না, এবং তাঁর জয়যাত্রার দিনে করতালি দেবার জন্যে আমার হাত তৈরিই ছিলো ; কিন্তু একথা কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে একজন অল্পবয়সী মার্কিনী লেখক এত শীঘ্রই এমন একখানা উপন্যাস লিখবে

যার তুলনা খুঁজতে যেতে হবে প্রাচীন গ্রীসের নাট্যজগতে। অসংখ্য দোষ ফক্‌নার-এর শেষ উপন্যাস "লাইট্ ইন্ অগাষ্ট্" ঈডিপাস-জাতীয় পুস্তক। অবয়বে ভেগ্নস্থান নিশ্চয়ই অনেক আছে, হয়তো শতাব্দী গুণে তার আয়ু কোনোদিনই করতে হবে না, তবু সে যে অমৃতের পুত্র, তা অন্তত আমার তর্কাতীত।

কথাগুলোর মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে কিনা বলতে পারি না, শুধু জানি যে বইখানা প্রথমে পড়েছিলুম প্রায় আটমাস আগে, এবং এখনো তার আমার উপরে পূরোমাত্রায় বিদ্যমান আছে। এই গুণ যে আধুনিক রচনার মধ্যে কত বিরল তা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাহলেও ইন্ অগাষ্ট'-এর আখ্যানসার সংগ্রহ করা আমার সাহসে কুলোচ্ছে না। তাছাড়া অত্যুচ্চ শ্রেণীর, অর্থাৎ এতে গল্পটি যে-উপায়ে বা যত কটি কথায় বলা হয়েছে, রূপান্তর বা সংক্ষেপ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তাই বলেই "লাইট্ ইন্ নির্দ্দোষ, এমন ভাবলে অন্যায় হবে। আখ্যানভাগের আপাত অসঙ্গতি, প্রত্য অভাব, বিষমতার প্রতি পক্ষপাত, উপকরণের অপচয়, এমনকি ব্যাকরণত্রুটি যত দোষ ফক্‌নার-এর লেখায় ইতিপূর্ব্বে দেখা গেছে, তার প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর এ-গ্রন্থেও উপস্থিত। কিন্তু সে-সমস্তকে অতিক্রম করে যে-লক্ষণ এই পুস্তকের পাতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আমার কাছে সেইটেই হচ্ছে রসসাহিত্যের সম্পদ। তরুণ লেখকদের মধ্যে ফক্‌নারই এইখানে প্রথম দেখিয়েছেন যে অনুকম্পা বিশ্বব্যাপী, সে-করুণা থেকে পায়ে-চলা পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত বঞ্চিত না সেইজন্যেই এই নীচতা ও নৃশংসতার কাহিনী পড়ে মনে মালিন্য আসে না, প্রসাদ। সেইজন্যেই এই বিকৃতচেতাদের পরিচয় পেয়ে অন্তর কলুষিত হয় না, চিত্তশুদ্ধি। সেইজন্যেই নায়ক ক্রিস্মাস্ নিজের বিসদৃশ বিকটতা শেষ পর্য্যন্ত রেখেও হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের প্রতিভূ। এতখানি সার্ব্বজনীনতা যে-পুস্তকের তার মধ্যে যদি সহস্র দোষও থাকে, তবু তাকে মহৎ আখ্যা দিতে কার্পণ্য আমার মতে, ভীরুতা।

ফক্‌নরা-এর শেষ বই তেরোটি গল্পের সমষ্টি। এগুলির সম্বন্ধে আলাদা কিছুই বলার নেই, উপরের দোষগুণগুলির সবই এখানে মজুৎ। তবে কোনো উৎকর্ষে 'লাইট্ ইন্ অগাষ্ট্'-এর সমতুল্য নয়। তার কারণ বোধহয় এই যে এর প্রতিভা ছোটগল্পের নাতিপরিসরে তেমন করে খেলেনা। তাছাড়া 'লাইট্ ইন্ অগাষ্ট'-এর আগে লেখা বলেই আমার বিশ্বাস। তবু বইখানি মোদীমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য, বিশেষ করে তাঁদের যাঁদের কাছে ফক্‌নার এখনো তাঁরা এই গল্পগুলিতে তাঁর পরিচয় পেয়ে নিশ্চয়ই খুসি হবেন; কারণ এগুলির পদ্ধতির যত প্রকারভেদ আছে, তা সত্যই রোমাঞ্চকর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ

বিজয়িনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১৷০ —প্রকাশক, পপুলার এজেন্সী, ১-৩ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজয়িনী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ অথবা নবতম রচনাবলীর অন্যতম। শৈলজানন্দ সম্প্রতি অনেকগুলি উপন্যাস বা বড় গল্প রচনা করিয়াছেন অথবা পূর্ব্ব রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সেইগুলি পাঠে মনে হয় তাহাদের রচনাকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নহে এবং বহু প্রসূতির সন্তানের মত অস্পষ্টতার নিদর্শন তাহাদের মধ্যে স্পষ্ট। এই প্রভূত প্রসবের মধ্যে গ্রন্থকারের আত্মশ্লাঘাই যে প্রবল, একথা আমাদের মনে হয় না, নিজের শক্তি-সম্বন্ধে অন্ধভক্তির স্থান তাহাতে নাই। এ বহু প্রসবের কারণ অন্য, কিন্তু কারণ যাহাই হউক ত্রুটীগুলি চোখে ঠেকিতেছে। রচনাগুলির মধ্যে গল্প পাইতেছি নিঃসন্দেহ, পাইতেছি না শিল্পীকে—আমাদের পরিচিত শৈলজানন্দকে। তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন অথবা এ আত্মবিলোপ।

বিজয়িনী বৈষ্ণবীকন্যা সুনন্দাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত বড় গল্প। উপন্যাসের মাল-মসলা ইহাতে নাই—সংগ্রহের প্রয়াস নাই। কে যেন গল্প শুনিতে চায় অতএব রচিত হইল গল্প। নায়ক হইল ধনী-গৃহের অনাদৃত পৌত্র স্নেহ-বুভুক্ষু সরল সুন্দর কিশোর—আর নায়িকা আগন্তুকা বয়ঃসন্ধিগতা বৈষ্ণবী। "হরিণের মত টানা টানা দু'টি চোখ—হাতের আঙ্গুলগুলি ঠিক যেন চাঁপার কলির মত"—ফলে প্রেম, বাধা সমাজ। অতএব নায়িকার পরম ও চরম স্বার্থত্যাগ। ভঙ্গী তাহার প্রচুর ভাবে নাটকীয়—অবশ্য নাট্যভঙ্গী বিবর্জ্জিত এ ত্যাগ শ্রোতাকে কখনই মুগ্ধ করিত না তা স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে।

গ্রন্থকার গল্প বলিয়াছেন—ঘটনা-সংস্থানের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন যত বেশি—চরিত্র-গঠনের দিকে অমনোযোগ দিয়াছেন সেই পরিমাণ। তাহারা সেই কারণে গল্পের পাত্র-পাত্রী রহিয়া গেল, মানুষ হইয়া উঠিবার মত যত্ন বা অবকাশ পাইল না।

যে শ্রোতা বা শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে এ গল্প—সে বা তাহারা হয়ত তৃপ্ত। সহজ লাবণীল ভাষায় রচিত কাহিনীটি হয়ত অনেককেই এমনি আনন্দ দিবে। আমাদের অতৃপ্তিটুকু কিন্তু না জানাইয়া পারিলাম না।

বিজয়িনীর ছাপা ভালো, কাগজ সুন্দর এবং বাঁধানো স্থায়ী ও রুচিসঙ্গত।

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রামকৃষ্ণ মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

বার্ষিক
৪৷০
প্রতি সংখ্যা
১৲

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪১

বিষয় সূচী